চল যাই চাঁদের দেশে

* শিশু-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় (সর্বশ্রেষ্ঠ) পুরস্কারপ্রাপ্ত [১৯৭০] *

চল যাই চাঁদের দেশে

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ, এম্. এস্-সি., ডি. ফিল্.
অধ্যাপক, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই ভাদ্র,
১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

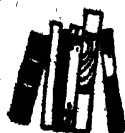
প্রথম সংস্করণ ঃ ১১০০ সংখ্যা মুদ্রিত
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২২০০ সংখ্যা মুদ্রিত
বৈশাখ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ

টা. ৪·৫০

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬



উৎসর্গ

আদরের শৈবালকে দিলাম

—বাবা



আমার কথা

১৬ই জুলাই, বুধবার, রথযাত্রা—মহাপ্রভু জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে, রথে চড়ে রওনা হলেন মাসির বাড়ি। সেখানে আটদিনের প্রবাস সেরে ২৪শে জুলাই, বৃহস্পতিবার, রথে চড়ে স্বস্থানে ফিরে এলেন। এই নিয়ে ভারতের ঘরে ঘরে উৎসবের সমারোহ।

এদিকে ঠিক রথযাত্রার দিনই তিনটি মানব সন্তান মহাকাশের রথে চড়ে পাড়ি দিলেন চাঁদমামার বাড়ির দিকে। সেখানে আটদিনের প্রবাস সেরে ঠিক উল্টোরথের দিনই তাঁরা আবার নির্বিঘ্নে ফিরে এলেন জননী পৃথিবীর কোলে; তাই নিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল। কী বিচিত্র যোগাযোগ, আর কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ! এর মধ্যে বিধাতার কী অমোঘ ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে তা কে জানে?

মানব ইতিহাসের সর্বাধিক রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক অভিযানের সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছে। চন্দ্র জয় ক'রে তিন মহাকাশচারী আবার পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে এসেছেন। এই বিজয়-গৌরব যে শুধু তিনজন মার্কিন মহাকাশচারীর, তা নয়। এ গৌরব সমগ্র মানবজাতির।

অজানাকে জানবার যে অদম্য ও অতৃপ্ত পিপাসা সমগ্র মানবজাতির রয়েছে, এ অভিযান তারই প্রতীক। কিন্তু চাঁদে পৌঁছানোয় যে শুধু একটা বৃহৎ পরিকল্পনার একটা দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ হ'ল, তা নয়। আসলে এ হ'ল আরও অনেক বড় বড় অভিযানের আরম্ভ। এবারে গ্রহ-গ্রহান্তরে যাবার চেষ্টা হবে। আর মহাকাশে চাঁদই হবে প্রথম মহাকাশ-বন্দর বা আন্তঃগ্রহ স্টেশন। এই ছোট্ট পৃথিবীর সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে আবদ্ধ থেকে মানুষ আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, এবার মহাকাশ জুড়ে তার যাতায়াত চলবে।

এটা কী ক'রে সম্ভব হয়েছে, মহাকাশ-বিজ্ঞান কী ক'রে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে, তারই এক বিচিত্র এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই পুস্তকে। পুস্তকখানি লেখা হয়েছে প্রধানতঃ বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের জন্য। পুস্তকখানি পাঠ ক'রে তারা যদি আনন্দলাভ করে এবং এ থেকে বিজ্ঞান-সাধনার জন্য কিছুটা অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে, তাহলে বুঝবো যে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ব্লক দিয়ে এবং ইউনাইটেড স্টেট্স ইন্‌ফরমেশন সার্ভিস (ইউ. এস্. আই. এস্.) কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। কয়েকটি মূল্যবান চিত্র পেয়েছি 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকা থেকে। এজন্য এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিভিন্ন মহাকাশ অভিযানের বিবরণ সংগ্রহ করেছি প্রধানতঃ 'স্প্যান', 'অ্যামেরিকান রিপোর্টার', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'যুগান্তর' থেকে। এই সুযোগে এইসব সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

যাঁদের আগ্রহাতিশয্যে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল তাঁরা হলেন অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীত্রিদিবেশ বসু এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র পরমপ্রীতিভাজন শ্রীজয়ন্ত বসু। এঁদের কাছে আমি চিরঋণী। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পুস্তকখানি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, এজন্য তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীসুনীলকুমার নাগ এ বিষয়ে আমাকে সর্বদাই উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করেছেন। আর শ্রীপবিত্রকুমার রায় চৌধুরী প্রুফ সংশোধন ক'রে এবং আরও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। এই সুযোগে এঁদের দু'জনকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বাধীনতা দিবস,
১৫ আগস্ট, ১৯৬৯

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

অল্পদিনের মধ্যেই এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়ায় সুখী হ'লাম।

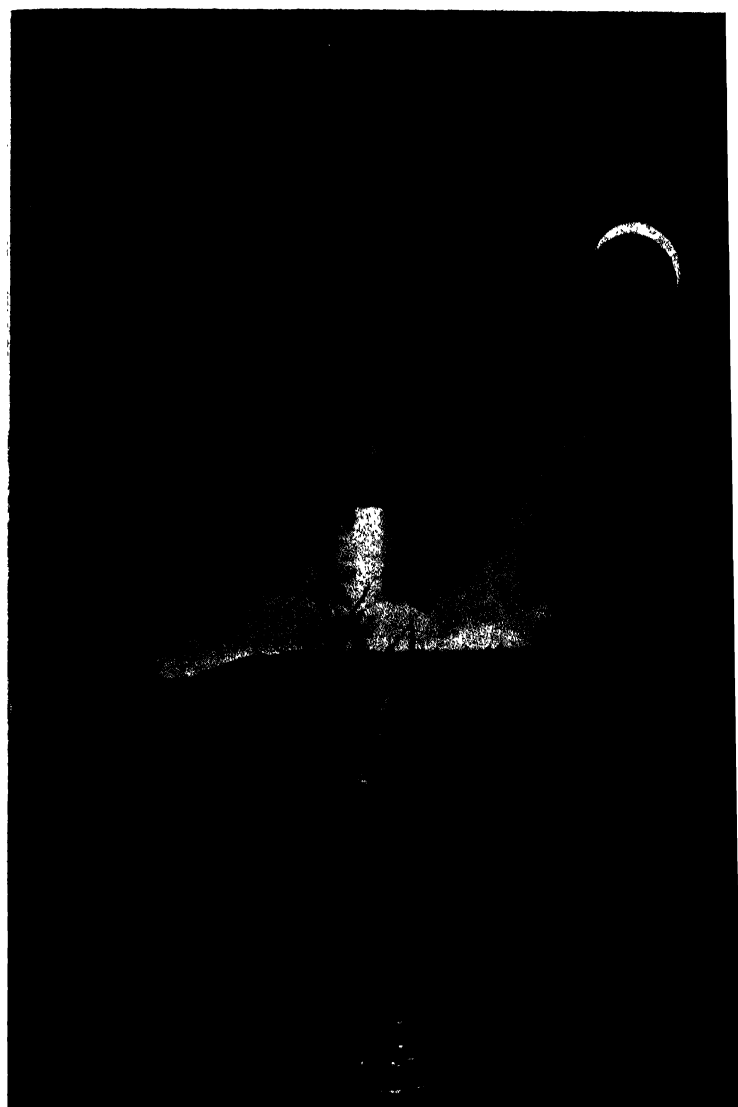
প্রথম সংস্করণে একটি ত্রুটি ছিল: চাঁদে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের ঐতিহাসিক অভিযান সংক্রান্ত প্রামাণিক চিত্রগুলি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এবারে সেই ত্রুটি কিছুটা সংশোধন করা হ'ল। ঐ অভিযান সংক্রান্ত ছ'টি এবং আরও তিনটি (মোট ন'টি) মূল্যবান চিত্র এবারে সংযোজিত হয়েছে। আটটি চিত্র পেয়েছি ইউনাইটেড স্টেট্স ইন্ফরমেশন সার্ভিস (সংক্ষেপে 'ইউ. এস্. আই. এস্.')-এর সৌজন্যে, আর একটি চিত্র পেয়েছি 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকার সৌজন্যে। এজন্য এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ-ছাড়া চাঁদের শান্ত-সাগর এলাকা থেকে কুড়িয়ে আনা পাথর ও মাটির নমুনাগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখার পর যে-সব রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তাদেরও এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই সংস্করণে।

বড়দিন
১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

সূচীপত্র



চল যাই চাঁদের দেশে

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবহমান কালের চাঁদ

রাতের আকাশে যা সবচেয়ে সহজে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হ'ল চাঁদ। সূর্য অস্ত গেলে, গোধূলির সোনাকে সরিয়ে জ্যোৎস্নার হীরা ঝরতে থাকে। উঁচু পাহাড়ের চূড়া, নদ-নদী, বন-উপবন সব যেন অপরূপ এক কিরণরেখায় ঝলমল করতে থাকে। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমগ্র পৃথিবীর বরতনু যেন এক মোহময় মাদকতায় ভরে ওঠে!

হাজার বছর ধরে দেশ-বিদেশের পুরাণে প্রবাদে কাব্যে লোক-গাথায় চাঁদের কত ছবি ফুটে উঠেছে! বাংলা দেশের কত ছড়ায় কবিতায়ও তো চাঁদের ছড়াছড়ি। এদেশের অসংখ্য ছড়ায় ও কবিতায় চাঁদের যে শুভ্র কমনীয় ছবি আঁকা রয়েছে, তা কি কেউ কখনও ভুলতে পারে!

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ,
মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা-দিদি কই?

খোকার কাছে চাঁদ কখনও চাঁদমামা, কখনও খরগোশ-কোলে শশাঙ্ক। কখনও সে কল্পনা করে যে, চরকা-বুড়ী একটা গাছের তলায় বসে চরকায় সূতো কাটছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে। আবার ঘুমের ঘোরে খোকা স্বপ্ন দেখে—

যেন কোন্ যাত্রী সে, রাত্রি অগাধ,
জ্যোৎস্না সমুদ্রের তরী যেন চাঁদ।
চলে যায় চাঁদে চ'ড়ে সারা রাত ধরি,
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে ছুঁয়ে যায় তরী।

এইভাবে খোকার মন উধাও হয়ে যায় কোথায় কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে!

আবার মায়ের কোলে খোকা যখন কাঁদে, তখন চাঁদকে দেখিয়েই মা তার কান্না থামান। ডেকে বলেন,—

আয় আয় চাঁদমামা টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥

চাঁদকে দেখে এক মুহূর্তেই খোকার কান্না যায় থেমে, সে তখন হাত বাড়িয়ে চাঁদকে ধরতে চায়। কিন্তু হাত বাড়ালেই কি চাঁদকে ধরা যাবে? চাঁদ রয়েছে আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় ত্ব' লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল (প্রায় ৩,৮৪,৮০০ কিলোমিটার)।

অবশ্য মহাকাশে চাঁদই হ'ল আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, তেমনি চাঁদও আবার পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, পশ্চিম থেকে পুবে।

আবহমান কালের চাঁদ সেই কবে থেকে মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে,—এসো, এসো, আমার মাঝে কী রহস্য লুকানো আছে, তা দেখবে এসো!

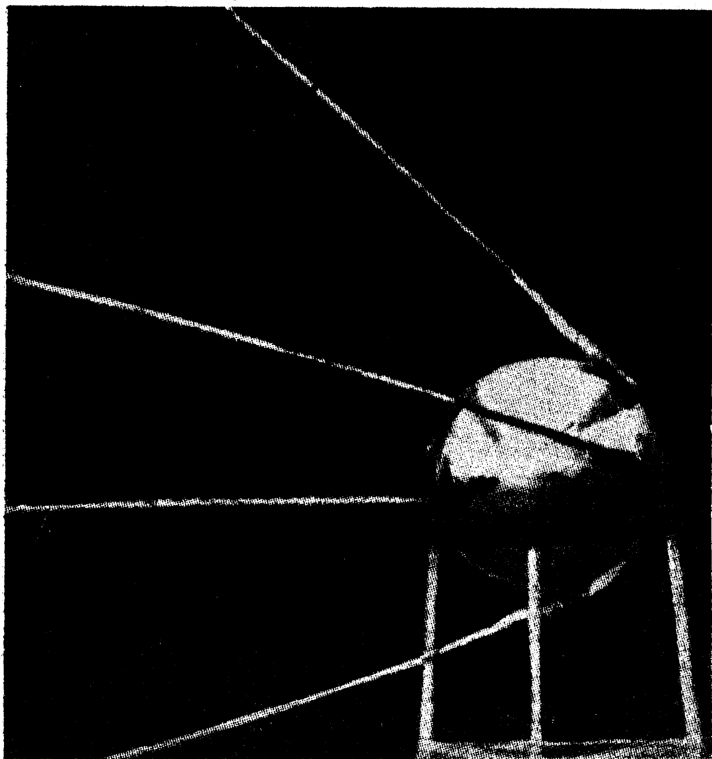
জলে, স্থলে আর আকাশে মানুষের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু তবুও সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তার কল্পনা-বিলাসী মন কতকাল ধরে স্বপ্ন দেখছে, কবে সে পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে পাড়ি জমাবে নিঃসীম নীল আকাশের দিকে। সুদূর আকাশচারী হংস-বলাকাদের পেছনে রেখে সে ছুটে যাবে চাঁদে, তারপর গ্রহে-গ্রহান্তরে!

মানুষের এই স্বপ্ন আজ অনেকাংশে সফল হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ চন্দ্র জয় করেছে, সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রে অবতরণ করেছে, তারপর নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছে জননী পৃথিবীর কোলে। এটা কী ক'রে সম্ভব হ'ল, তাই এখন বলছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষ মহাকাশ জয় ক'রল

মহাকাশ জয়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। সেদিন সারা পৃথিবী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে শুনলো,



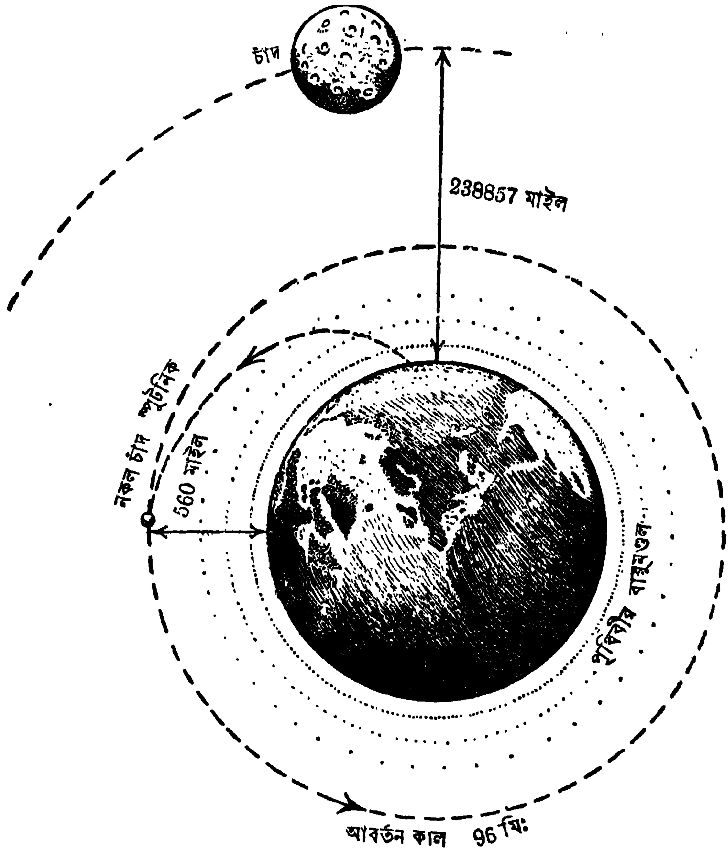
চিত্র ১

সোভিয়েত রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ বা নকল চাঁদ স্পুৎনিক-এর ছবি।
উপগ্রহটির চারটি অ্যান্টিনাও দেখা যাচ্ছে।

[বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

সোভিয়েত রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুৎনিক' (শিশুচাঁদ) পৃথিবীর ৫৬০ মাইল উপর দিয়ে একটি কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

এর ওজন ৮৩'৬ কিলোগ্রাম ; কক্ষপথে আবর্তনের সময় ৯৬ মিনিট। পৃথিবীর মানুষ উৎকর্ণ হয়ে শুনলো আগামী ইতিহাসের পদধ্বনি—বিপ্ বিপ্ বিপ্।



চিত্র ২

সোভিয়েত রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ বা নকল চাঁদ স্পুৎনিক-এর কক্ষপথ।

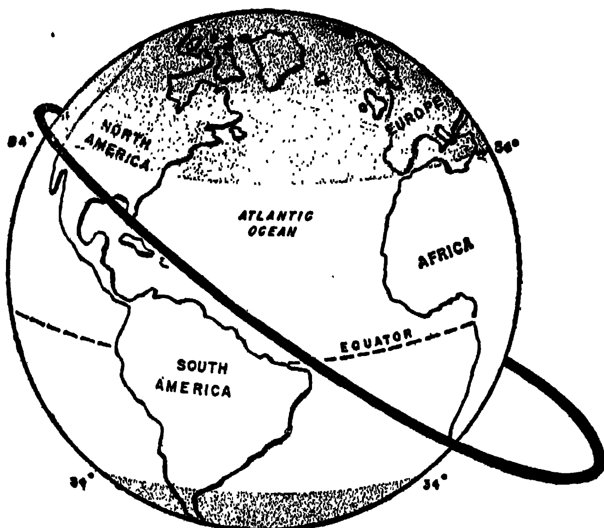
একমাস পরেই সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বিতীয় 'স্পুৎনিক' আকাশে উঠলো জীবন্ত কুকুর লাইকাকে সঙ্গে নিয়ে। এর ওজন প্রথমটির

চিত্র ৩। কৃত্রিম উপগ্রহবাহী জুপিটার-সি রকেটটির উর্ধ্বাকাশে

চিত্র ৪। জুপিটার-সি রকেটটি কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরারকে

প্রায় ছ'গুণ। মহাকাশের প্রথম যাত্রী এই কুকুরটি মহাকাশেই মারা গেল, জীবিত অবস্থায় তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হ'ল না। তবুও এই অভিযান থেকে এমন অনেক তথ্য সংগৃহীত হ'ল যার ফলে ভবিষ্যৎ অভিযানের সাফল্য সুনিশ্চিত হ'ল।

মার্কিন দেশেও কৃত্রিম উপগ্রহ বা নকল চাঁদ স্থাপনের চেষ্টা চলছিল কয়েক বছর ধরে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হচ্ছিল। রাশিয়ার অভাবনীয় সাফল্যে যখন সারা পৃথিবী মুখরিত



চিত্র ৫। মোটা কালো রেখাটি পৃথিবীর চারিদিকে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ বা নকল চাঁদ এক্সপ্লোরারের কক্ষপথ নির্দেশ ক'রছে।

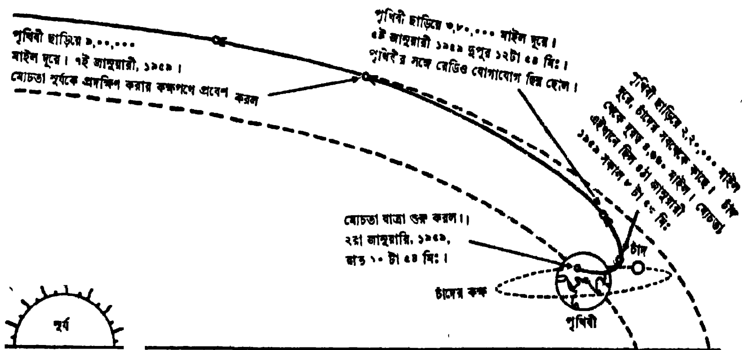
[বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

হয়ে উঠলো, তখন মার্কিন দেশে এই উদ্যম তীব্রতর করা হ'ল। এর ফলে ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী একটি জুপিটার-সি রকেট সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হ'ল। এরই সাহায্যে প্রথম মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ 'এক্সপ্লোরার-১' মহাকাশে স্থাপিত হ'ল। এর ওজন মাত্র ১০ পাউণ্ড, আবর্তনের সময় ১১৪ মিনিট। কক্ষপথের

সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান বা অনুভূ ২৩০ মাইল, আর সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান বা অপভূ ১,৬০০ মাইল দূরে অবস্থিত। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে মহাকাশ জয়ের প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রকাশ ক'রল।

এর পর আমেরিকা এবং রাশিয়া থেকে পর পর অনেকগুলি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যাপারেই রাশিয়ার উপগ্রহ নূতন ইতিহাস রচনা করেছে। আমেরিকার উপগ্রহ তার ধারে-কাছেও যেতে পারেনি।

১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী রাশিয়ার প্রথম 'লুনিক' চন্দ্র অভিমুখে যাত্রা করে। দুঃখের বিষয় তা চাঁদের প্রায় ৪,৬৬০ মাইল দূর দিয়ে চাঁদের এলাকা অতিক্রম ক'রে যায় এবং শেষে একটি কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। হিসেব অনুযায়ী এই কক্ষ উপবৃত্তাকার এবং পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মাঝে অবস্থিত। সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে এর সময় লাগবে



চিত্র ৬। নকল গ্রহ ম্যেচতার গতিপথ।

প্রায় পনের মাস। এইভাবে পৃথিবীর মানুষ সৌরজগতে একটি নকল গ্রহ স্থাপন করতেও সক্ষম হ'ল। সেই অবধি কোন রকেট পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে মহাকাশে যেতে পারেনি। তাই এই ঘটনাটি আন্তগ্রহ যোগাযোগের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে

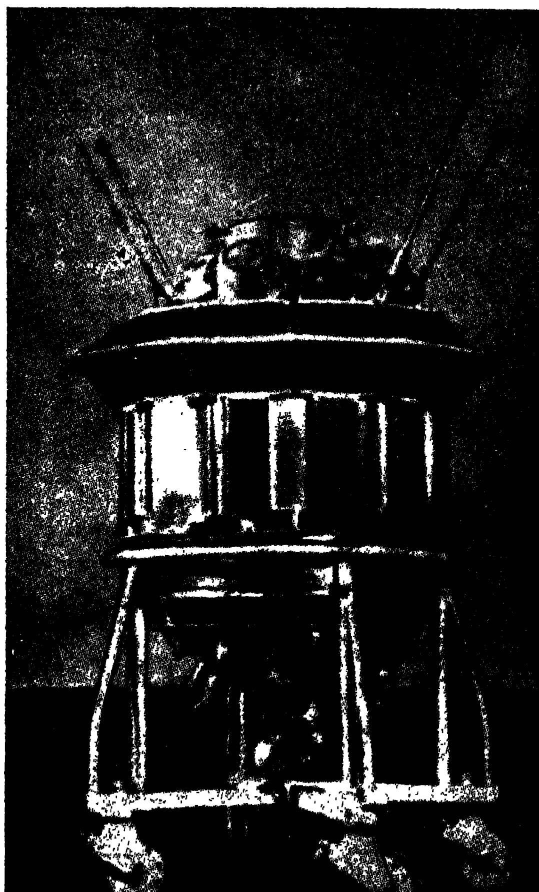
স্বর্ণাক্ষরে। নূতন গ্রহটি মানুষের বহুকালের স্বপ্ন আংশিকভাবে সফল ক'রল। তাই রুশ বিজ্ঞানীরা তার নূতন নামকরণ করলেন 'মেচতা' (স্বপ্ন)।

প্রথম 'লুনিক' লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লেও দ্বিতীয় 'লুনিক' সাফল্যের সঙ্গে চাঁদে গিয়ে পৌঁছালো ১৩ই সেপ্টেম্বর। পৃথিবী থেকে চাঁদে পৌঁছাতে এর সময় লাগলো প্রায় ৩৪ ঘণ্টা। এই সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপিত হ'ল কাস্তে ও হাতুড়ি চিহ্নিত সোভিয়েত সরকারের প্রতীক। ভবিষ্যতে যদি কোন দিন চন্দ্রের অধিকার নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়, তবে রুশরা যে অগ্রাধিকারের দাবি পেশ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, এ খবর তো সবাই জানে। কিন্তু আর একটা মজার খবর ক'জন রাখে ? চাঁদ নিজের মেরুদণ্ডের ওপরও ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। কিন্তু আমরা তো বরাবর চাঁদের একটা দিকই দেখতে পাই, এর কারণ কী ? বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখিয়েছেন, পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে চাঁদের যতটুকু সময় লাগে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে চাঁদ নিজের মেরুদণ্ডের ওপরও একবার পাক খায়, অর্থাৎ পৃথিবীর এক চান্দ্রমাস চাঁদের একদিনের সমান। এর অর্থ হ'ল, চাঁদের কোন একটি জায়গায় সূর্যের আলো পাওয়া যায় প্রায় ১৫ দিন ধরে, আর প্রায় ১৫ দিন ধরে সেখানে থাকে রাত্রির অন্ধকার। তাই চাঁদের একটা দিকই সব সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। চাঁদের আর এক পিঠে কি আছে, তা পৃথিবী থেকে কখনও দেখা যায় না। এজন্য চাঁদের অন্য পিঠে কি আছে, তা জানবার আগ্রহ সকলেরই অপরিসীম।

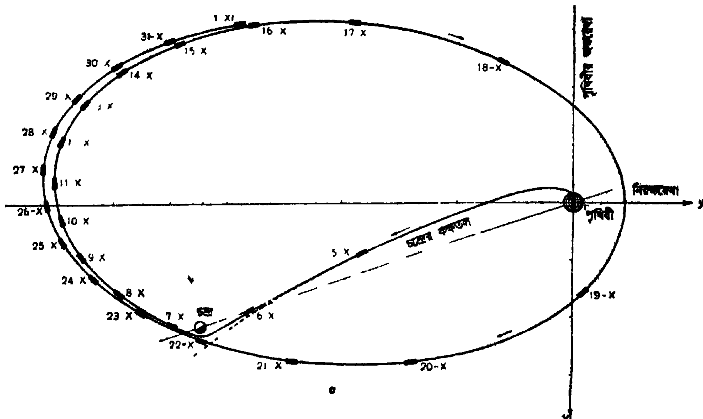
১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনলো একটি নূতন খবর। ঐদিন রাশিয়া চাঁদের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করার উদ্দেশ্যে মহাকাশে পাঠালো একটি উড়ন্ত পর্যবেক্ষণাগার। তৃতীয় 'লুনিক' চাঁদের অগোচর দিকের, অর্থাৎ

যে-দিকটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না সে-দিকের, আলোকচিত্র



চিত্র ৭
মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত উড়ন্ত পর্যবেক্ষণাগার তৃতীয় 'লুনিক'। ১৯৫৯ সালে
এরই সাহায্যে সর্বপ্রথম চাঁদের অগোচর দিকের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।
['সোভিয়েত দেশ' থেকে গৃহীত]

গ্রহণ ক'রল এবং স্বয়ংক্রিয় বেতারবীক্ষণ ব্যবস্থায়, অর্থাৎ টেলিভিশনে, সেই ছবি পাঠিয়ে দিল পৃথিবীতে।



চিত্র ৮। স্বয়ংক্রিয় আন্তগ্রহ স্টেশনের গতিপথ। যাত্রাকাল ৪ঠা অক্টোবর থেকে আরম্ভ ক'রে ১লা নভেম্বর (১৯৫৯) পর্যন্ত প্রতি ২৪ ঘণ্টা অন্তর, আন্তর্জাতিক সময় ০ ঘণ্টায়, স্বয়ংক্রিয় আন্তগ্রহ স্টেশনের অবস্থান-চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৯-এর পরিচয়লিপি :

[চাঁদের অগোচর দিক]

1. মস্কো-সাগর—এর ব্যাস প্রায় ১৮৬ মাইল (প্রায় ৩০০ কি. মি.)
2. অ্যাস্ট্রোনট্স উপসাগর
3. দক্ষিণের সাগরের কিছু অংশ
4. ত্সিওলকভ্স্কি—একটি গিরি-কেন্দ্রিক গহ্বর, এর ব্যাস প্রায় ৬০ মাইল (প্রায় ১০০ কি. মি.)
5. লমোনোসভ্—একটি গিরি-কেন্দ্রিক গহ্বর
6. জ্যোলিও কুরী—একটি গহ্বর
7. সোভিয়েত পর্বতমালা
8. স্বপ্ন-সাগর।

[চাঁদের যে-দিকটা পৃথিবী থেকে দেখা যায়, তারও কিছু অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে]

I. হাম্বোল্ট্-সাগর (Humboldt's Sea)
II. সংকটের সাগর (The Sea of Crisis)
III. প্রান্তস্থ সাগর (The Marginal Sea)
IV. ঢেউয়ের সাগর (The Sea of Waves)
V. স্মাইথ-এর সাগর (Smyth's Sea)
VI. উর্বরতার সাগর (The Sea of Fertility)
VII. দক্ষিণের সাগর (The Southern Sea)।

[পূর্বের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

এই ছবিতে দেখা যায়, চাঁদের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই একঘেয়ে। তবে চন্দ্রপৃষ্ঠে বহুদূর বিস্তৃত সাদা অংশের স্থানে স্থানে রয়েছে ছোট-বড় কতকগুলি কালো দাগ। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাদের তাৎপর্য বোঝা কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই চিত্র দেখেই সাগর-উপসাগর, পাহাড়-পর্বত, গর্ত প্রভৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এবং তাদের নামকরণও করেছেন।

এরপর মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে শুরু হ'ল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৬০ সালের ১৯শে আগস্ট রাশিয়া একটি



চিত্র ১০

স্ত্রেল্‌কা

['সোভিয়েত দেশ' থেকে গৃহীত]

উপগ্রহে ক'রে 'স্ত্রেল্‌কা' ও 'বেল্‌কা' নামে ছু'টি কুকুরকে মহাকাশ-পরিক্রমায় পাঠিয়ে আবার পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে সক্ষম হ'ল।

শুধু তাই নয়, ক্যাপ্সুলের মধ্যে এদের সঙ্গে কয়েকটি ইঁদুর, কতকগুলি মাছি এবং কতকগুলি উদ্ভিদ্ও পাঠানো হয়।

অতিকায় এই মহাকাশযানটির ওজন ছিল প্রায় সাড়ে চার টন। পৃথিবী থেকে গড়ে প্রায় ২০০ মাইল উর্ধ্বে থেকে তা প্রায় দেড় ঘণ্টায় একবার ক'রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে। এভাবে মহাকাশের কক্ষপথে ১৭ বার ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ ক'রে ১৮ বারের বার



চিত্র ১১
বেল্কা

['সোভিয়েত দেশ' থেকে গৃহীত]

মানুষের ইঙ্গিতে তা আবার ভূপৃষ্ঠে নেমে এসেছে—যেখানে নামবার কথা ছিল সেখান থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে। মহাজাগতিক মানদণ্ডে এই বিচ্যুতি একেবারেই তুচ্ছ বলা যায়।

মহাশূন্যে থাকাকালেই মহাকাশযানের আরোহী কুকুর দু'টির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয় স্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন-ব্যবস্থায়। পর পৃষ্ঠায় তারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে দেওয়া হ'ল :

"রকেটটি যখন যাত্রা ক'রল, তখন কুকুর দু'টির কান খাড়া হয়ে উঠলো, তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। কয়েক মিনিট পরে তাদের চোখে দেখা দিল উদ্বেগের ছায়া—তারা এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে আরম্ভ ক'রল। মহাকাশযানের গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের শক্তি তাদের যেন নীচের দিকে টেনে ধরলো। রকেটের গতিবেগ যত বাড়তে থাকলো, ততই তারা চেপ্টে যেতে লাগলো মাধ্যাকর্ষণের টানে। স্ত্রেল্‌কা ছটফট ক'রে এদিক-ওদিক তাকাতে আরম্ভ ক'রল। এরপর কিছুক্ষণ উভয়েই একেবারে শান্ত। রকেট ভারশূন্য-লোকে গিয়ে প্রবেশ ক'রল। কুকুর দু'টি তখন কেবিনের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগলো, যেন প্রাণহীন, যেন তাদের গ্রন্থিগুলি সব খুলে গেছে। রকেটটি তার কক্ষপথে পৌঁছবার পর এদের নাড়ী-স্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে এল। তখন তারা আস্তে আস্তে হাত-পা নাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। বেল্‌কা রেগে কয়েকবার ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে তারা এই নূতন অবস্থায় ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। তখন স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা খাবারের বাক্সটির ঢাকনা খুলে দিতেই তারা খেতে আরম্ভ ক'রল।"

রাশিয়া এভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে সাফল্যের পথে। তারপর মানুষ পাঠাবার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নানারকম মহড়া চলেছে অনেকদিন ধরে। শেষে একদিন এক শুভ-মুহূর্তে পৃথিবীর প্রথম মানুষ পাড়ি দিয়েছে মহাকাশের দিকে, পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরে আবার নির্বিঘ্নে নেমে এসেছে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে।

এই দুঃসাহসী মহাকাশ-বিজয়ীর নাম ইউরি গাগারিন। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে প্রায় পাঁচ টন ওজনের একখানা মহাকাশযানে ক'রে গিয়ে তিনি ১০৮ মিনিট মহাকাশে ছিলেন, পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন একবারের সামান্য একটু বেশী। মহাকাশযানটির নাম দেওয়া হয় 'ভোস্তক' (প্রাচী বা উদয়াচল)। ভোস্তক যখন



চিত্র ১২। স্ত্রেল্‌কা



চিত্র ১৩। বেল্‌কা

(সোভিয়েত মহাকাশযানে বসানো একটি টেলিভিশন-যন্ত্র এই ফটো পাঠিয়েছে)

['সোভিয়েত দেশ' থেকে গৃহীত]

পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে, তখন তার দূরত্ব ছিল ১০৯ মাইল। আর সবচেয়ে দূরে থাকাকালে তার দূরত্ব ছিল ১৮৭ মাইল। একবার পৃথিবী পরিক্রমা করতে এর সময় লাগে ৮৯ মিনিট। ঐ সময়



চিত্র ১৪

ইউরি গাগারিন (মহাকাশে যাত্রার পূর্বে)

['সোভিয়েত দেশ' থেকে গৃহীত]

ভোস্তক-এর গতিবেগ হয়েছিল ঘণ্টায় ১৭,০০০ মাইল, অর্থাৎ সেই অবধি মানুষ যত দ্রুতবেগে চলতে সক্ষম হয়েছে তার প্রায় ছ'গুণ।

মহাকাশ থেকে গাগারিন যে-সব বেতার-বার্তা প্রেরণ করেন, মস্কো থেকে তার রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়। তিনি বলেন,—"পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে,—পরিষ্কারভাবে আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।" কিছুক্ষণ পরে আবার—"মহাকাশযান স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি,…সব কিছু দেখতে পাচ্ছি,…আমার ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী

শূন্যলোকে টুকরো টুকরো মেঘ।" কিছুক্ষণ পরে আবার—"পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছি, সব কিছু স্বাভাবিক, যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে,…এগিয়ে চলেছি।" মহাকাশযান থেকে গাগারিনের শেষ বার্তা—"বেশ সুস্থ আছি, ফুর্তিতে রয়েছি…মহাকাশযানে চড়ে বেশতো প্রদক্ষিণ করছি পৃথিবীকে। সব ভালো, চমৎকার… যন্ত্রপাতিগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে।"

পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করার পরে গাগারিন বলেন,—"দেখলাম, আকাশ অন্ধকার, অতিমাত্রায় অন্ধকার, সূচীভেদ্য অন্ধকার বলতে



চিত্র ১৫। গাগারিনকে নিয়ে রকেট মহাকাশে উঠছে।

['সোভিয়েত দেশ' থেকে গৃহীত]

যা বোঝায়, ঠিক তাই। পৃথিবীর রং নীলাভ, তা সত্ত্বেও সব কিছু পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল। খুব উঁচুতে উঠে জেট প্লেন থেকে

যেমন দেখা যায়, পৃথিবীকে আমি সে-রকম দেখেছি। পাহাড় বন দ্বীপ সব কিছু পরিষ্কার দেখা গেছে।"

আলোকিত অংশ থেকে অন্ধকার নিবিড় কালো আকাশের, যে আকাশে নক্ষত্র দেখা যায়, তার বর্ণময় রূপ-পরিবর্তন তিনি দেখেছেন।



চিত্র ১৬। মহাকাশ-বিজয়ী ইউরি গাগারিন (১২ এপ্রিল, ১৯৬১)।

['সোভিয়েত দেশ' থেকে গৃহীত]

এই সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ, যেন একটি সূক্ষ্ম মেখলা জড়ানো রয়েছে পৃথিবীর গায়ে। দিগন্তের দৃশ্য সত্যিই অনুপম। উপরে উঠে পৃথিবীকে দেখে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, আনন্দে চীৎকার ক'রে ওঠেন,—"কী সুন্দর এই পৃথিবী !"

গাগারিনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পর পর আরও কয়েকজন মহাকাশ পরিক্রমায় যাত্রা করেন এবং নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। রাশিয়ার দ্বিতীয় মহাকাশচারীর নাম তিতভ। ভোস্তক-২

নামক মহাকাশযানে ক'রে ১৯৬১ সালের ৬ই আগস্ট তিনি মহাকাশে যাত্রা করেন।



চিত্র ১৭। জন গ্লেন—মার্কিন মহাকাশচারীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম মহাকাশের কক্ষপথে গিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার গৌরব অর্জন করেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২, মহাকাশে উৎক্ষেপণের পূর্বে তিনি তাঁর ফ্রেণ্ডশিপ-৭ নামক মহাকাশযানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

[ইউ. এস্. আই. এস্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহাকাশ জয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৮ সালেই স্থাপিত হয় 'নাসা' (NASA = National Aeronautics and Space Administration) এবং সঙ্গে সঙ্গে মারকারি-প্রকল্প অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে যায়। তবে সাফল্য আসে কিছু দেরীতে।

আমেরিকার প্রথম মহাকাশ-যাত্রীর নাম অ্যালেন শেপার্ড। ১৯৬১ সালের ৫ই মে কেপ্ কেনাভেরাল (এখন এর নাম কেপ্ কেনেডি) থেকে যাত্রা ক'রে তিনি মহাকাশ জয় করতে সক্ষম হন। তবে তিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন নি, সোজাসুজি মহাশূন্যে উঠে আবার নেমে আসেন। সময় লাগে মাত্র পনের মিনিট। আমেরিকার দ্বিতীয় মহাকাশ-যাত্রীর নাম ভার্জিল গ্রিসম্। তিনি ঐ বছরই ২১শে জুলাই মহাকাশ জয় করেন।

মার্কিন মহাকাশচারীদের মধ্যে জন গ্লেন-ই সর্বপ্রথম মহাকাশের কক্ষপথে গিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৬২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় সময় রাত্রি ৮টা ১৮ মিনিটে একটি অ্যাটলাস রকেট গ্লেনকে নিয়ে মহাকাশের দিকে যাত্রা করে। গ্লেন ফ্রেণ্ডশিপ-৭ নামক মহাকাশযানে ক'রে মহাকাশের কক্ষপথে গিয়ে এবং তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে তারপর ভারতীয় সময় রাত্রি ১টা ১৩ মিনিটে নিরাপদে অতলান্তিক মহাসাগরে অবতরণ করতে সক্ষম হন।

এই প্রসঙ্গে ভ্যালেন্টিনা তেরেশ্‌কোভা নামে একটি রুশ তরুণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৬৩ সালের জুন মাসে ভোস্তক-৬ নামক মহাকাশযানে ক'রে সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ পরিক্রমা শেষ ক'রে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে সক্ষম হন। আজ অবধি তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি মহাকাশ পরিক্রমার গৌরব অর্জন করতে পেরেছেন।

এইভাবে প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব শেষ হ'ল, কিন্তু বরমাল্য তখনও রাশিয়ার গলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাকাশ-বিজয়ের পথে

কয়েকটি সমস্যা ও তাদের সমাধান

মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ :

সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। বিজ্ঞানী নিউটন বাগানে গাছতলায় বসে আছেন, হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল পড়লো। তাঁর মনে হ'ল, তাইতো, আপেলটা মাটিতে পড়লো কেন? ফল পাকলে তো চিরকাল মাটিতে পড়ে, এ নিয়ে আবার কে কত ভাবে! বিজ্ঞানী নিউটনের মনে এরূপ একটি প্রশ্ন জেগেছিলো ব'লেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, পৃথিবী সব জিনিসকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, তাই পৃথিবীর আকর্ষণে আপেলটি মাটিতে পড়ে। কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ, তাকে অভিকর্ষ বলা হয়।



চিত্র ১৮
নিউটন

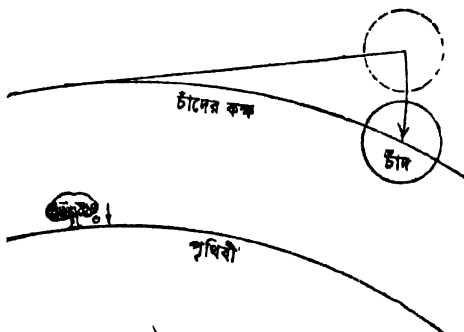
এইভাবে চিন্তা করতে করতে নিউটন আরও বুঝলেন যে, এই পৃথিবীর আকর্ষণে বাঁধা পড়েই চাঁদ তার চারিদিকে ঘুরছে। পৃথিবীর আকর্ষণে গাছ থেকে আপেল পড়া এবং পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের ঘোরা, এ দু'টি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করা খুবই কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নেই। ক্রমে নিউটন আরও বুঝলেন যে, সূর্যের বিপুল

আকর্ষণ আছে ব'লেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো তার চারিদিকে ঘুরছে। এইভাবে একটা সামান্য ঘটনার মীমাংসা করতে গিয়ে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হ'ল।

বিজ্ঞানী নিউটনের মতে সকল জড়-বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে; এর নাম মহাকর্ষ। এটা নির্ভর করে কোন্ বস্তুতে কতটা জড়-পদার্থ আছে তার উপর, অর্থাৎ বস্তুর ভর (mass)-এর উপর। তুলাদণ্ডে ওজন ক'রে যা জানা যায়, তাকেই বস্তুর ভর বলা হয়। বস্তুর ভর যত বেশী হয়, মহাকর্ষের বল (force)-ও তত বেশী হয়।

পৃথিবীর বাধা ঃ

এখন আমরা জানি যে, উপরদিকে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলে তা আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে। এর প্রধান কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ, অর্থাৎ অভিকর্ষ। আর একটা বাধা আছে, তা হ'ল বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণ-জনিত বল। উপরদিকে কয়েক শ' মাইল পরেই



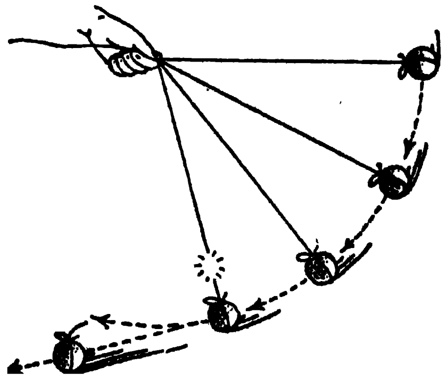
চিত্র ১৯

বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, পৃথিবীর আকর্ষণ বা অভিকর্ষ আছে বলেই গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ে। একই কারণে, চাঁদও অবিরাম পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে চলেছে চক্রাকার পথে।

বায়ু আর নেই বললেই চলে। এখন কোন প্রকারে যদি একটা ঢিল ছুঁড়ে এই স্তরটা পার ক'রে দেওয়া যায়, তখন বায়ুর বাধা আর থাকবে না, থাকবে শুধু অভিকর্ষের টান।

পৃথিবী সব সময়ই চাঁদকে আকর্ষণ করছে, কিন্তু কই চাঁদ তো পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে না! কিসের জোরে সে অবিশ্রান্ত ঘুরে ঘুরে চলেছে শূন্যপথে নির্দিষ্ট কক্ষে? চাঁদ ঘণ্টায় ২,২৩৫ মাইল বেগে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। এই চক্রবেগ থাকায় চাঁদ প্রতিমুহূর্তেই তার কক্ষপথ থেকে স্পর্শক বরাবর বাইরের দিকে ছুটে যেতে চাইছে, কিন্তু অভিকর্ষের টান তাকে সব সময় ঐ নির্দিষ্ট কক্ষপথে চালনা করছে। এই দু'টি বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটেছে, তাই চাঁদও অবিরাম ঘুরে চলেছে স্বচ্ছন্দ-গতিতে চক্রাকার পথে।

এটা আমরা নিজেরাই পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি। একটা ঢিলকে যদি সূতোয় বেঁধে ঘোরানো যায় তাহ'লে দেখা যাবে, ঢিলটির একটা বহির্মুখী গতি হয়েছে যার ফলে তা সব সময় বাইরের দিকে ছুটে যেতে চাইছে। কিন্তু সূতোর আকর্ষণ-জনিত বল তাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখছে। এই দুই বিপরীত বলের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়েছে ব'লেই ঢিলটি চক্রাকারে ঘুরছে স্বচ্ছন্দ-গতিতে। দৈবাৎ এই সাম্য যদি নষ্ট হয়, অর্থাৎ দৈবাৎ সূতো যদি ছিঁড়ে যায়, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে ঢিলটি ছুটে যাবে বাইরের দিকে।



চিত্র ২০
দৈবাৎ সূতো যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঢিলটি ছুটে যাবে বাইরের দিকে।

চাঁদের বেলায়ও এরকম দু'টি বিপরীত বলের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়েছে। এখন যদি কোন কারণে চাঁদের গতিবেগ কমে যায়, তবে পৃথিবীর আকর্ষণে সে লুটিয়ে পড়বে পৃথিবীর উপর। আবার

গতিবেগ যদি বেড়ে যায়, তবে সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরকালের জন্য উধাও হয়ে যাবে মহাশূন্যের অসীম অন্ধকারে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখলেন, কোন বস্তু যদি ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে চলতে পারে, তবেই তার পক্ষে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এর নাম 'মুক্তি-বেগ' (Escape velocity)। ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল গতিবেগ অর্জন করতে না পারলে কোন বস্তুই পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, একথা ঠিক। কিন্তু কোন বস্তু যদি ঘণ্টায় ১৫,৮০০ মাইল বা তার চেয়ে বেশী বেগে চলতে সক্ষম হয়, তবে একটা মজার ব্যাপার হবে। ঐ বস্তুটি তখন চাঁদের মতোই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে থাকবে, অর্থাৎ তা একটি নকল চাঁদে পরিণত হবে।

কিন্তু এক ধাক্কায় বস্তুটির গতিবেগ ২৫,০০০ মাইল বা তার কাছাকাছি করলে আর একটা বড় সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। এ হচ্ছে বাতাসের ঘর্ষণ-জনিত সমস্যা। আমরা জানি, পৃথিবীর আকর্ষণে এক-একটি উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ডবেগে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে। কিন্তু বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এই উল্কাপিণ্ড এত গরম হয়ে ওঠে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাবার আগেই তা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কাজেই বিজ্ঞানীর কল্পিত মহাকাশযান শুরু থেকেই একটা বিরাট গতিবেগ নিয়ে এগোতে পারবে না। তা করতে গেলেই মহাকাশযানটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এজন্য প্রথম-দিকে মহাকাশযানের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম রাখতে হয়। এভাবে তাকে বাতাসের স্তরটা পার ক'রে দিতে হয়। তারপর এই বেগ ক্রমশ বাড়ানো হয় ধাপে ধাপে।

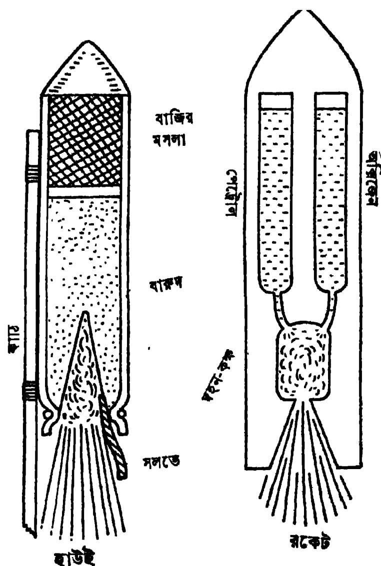
রকেট ঃ

মহাশূন্যে অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে যে মহাকাশযান ব্যবহার করা হবে, তাতে সাধারণ বিমান বা এরোপ্লেনের মতো কোনো

'প্রপেলার' বা চালন-চক্র থাকলে চলবে না। কারণ পৃথিবীর কয়েক শ' মাইল উপর থেকেই বায়ু নেই বললেই চলে। আর বায়ুর অভাবে সেখানে ইঞ্জিন ও চালন-চক্র দুই-ই অচল হয়ে পড়বে। কাজেই মহাশূন্য-অভিযানের বর্তমান চাবিকাঠি অর্থাৎ বাহক হচ্ছে 'রকেট'।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রকেটের অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ হাউই-বাজীর কথা জানতো। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, ১২৩২ সালেরও আগে থেকেই চীনদেশে উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে হাউই-বাজী পোড়ানো হ'ত। তারপর অনেক দেশেই যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে 'রকেট' বা হাউই ব্যবহার করা হ'ত। তবে সেগুলি কয়েক শ' ফুটের বেশী উপরে উঠতে পারতো না। আর হাউই কখন কোন্ দিকে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এজন্য সব সময় নিশানা ঠিক রাখা যেত না।

কালীপূজোর সময় তো তোমরা অনেকেই হাউই বাজী পোড়াও। হাউইয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেই তা প্রচণ্ড বেগে আকাশের দিকে ছুটে যায়। এর কারণ কী? বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন, প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য বিপরীতমুখী এবং সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হাউইয়ের মসলায় আগুন লাগালে তা খুব তাড়াতাড়ি পুড়তে থাকে, এর ফলে হাউইয়ের তলা দিয়ে প্রবল বেগে গ্যাস



চিত্র ২১

বেরুতে থাকে। এই গ্যাস বেরুনোটা হ'ল ক্রিয়া। কাজেই এর সমান বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই দেখা দেবে। অর্থাৎ ঐ গ্যাস যত জোরে তলা দিয়ে বেরুতে থাকবে, প্রতিক্রিয়া ঠিক তত জোরে হাউইটিকে উপরদিকে ঠেলা দিয়ে ওঠাতে থাকবে। যে হাউইয়ের মসলা ভালো এবং পরিমাণে বেশী হবে, তা আকাশে অনেক বেশীদূর উঠবে। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর ক'রেই 'রকেট' নির্মিত হয়েছে।

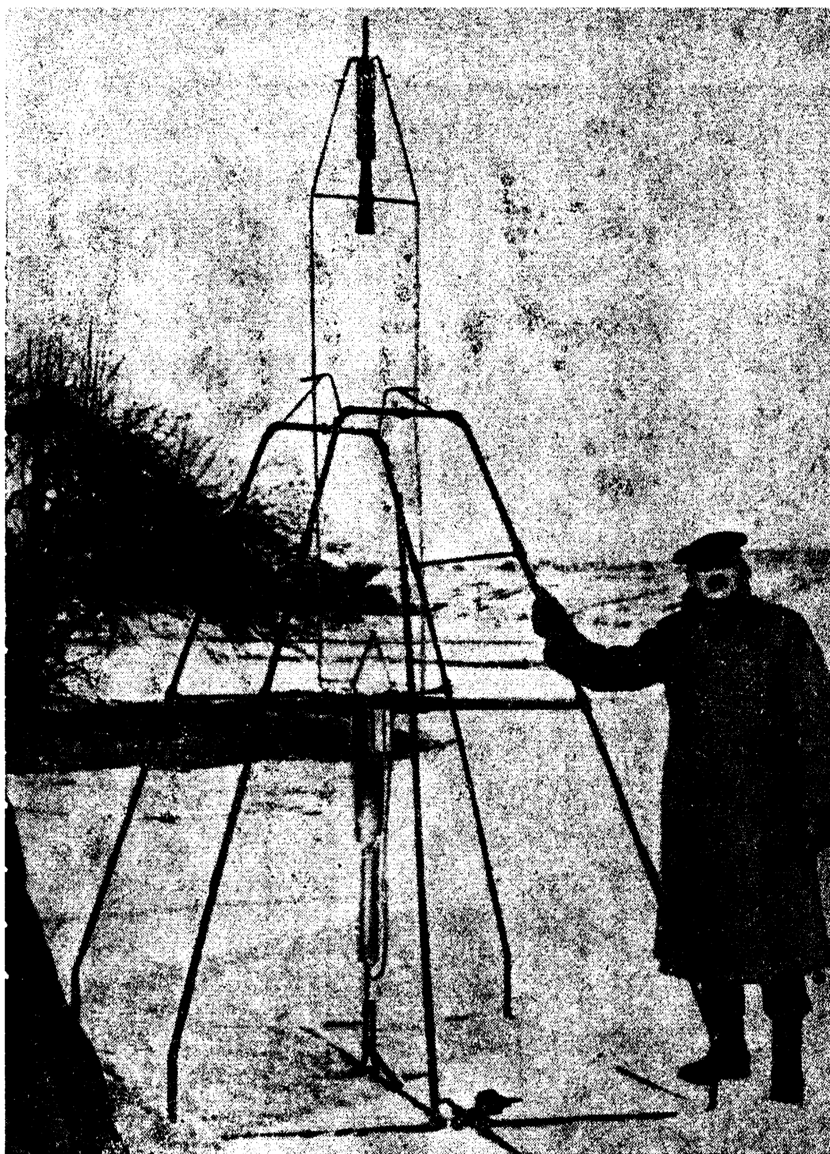
প্রথম যুগের সব রকেটেই জ্বালানি হিসেবে বারুদ ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু কঠিন জ্বালানি ব্যবহারে অসুবিধা হ'ত। কারণ রকেটের বারুদ সবটা সমানভাবে পুড়তো না।

এ যুগের রকেটের কথা বলতে হ'লে প্রথমেই রুশ বিজ্ঞানী কনস্তান্তিন ত্সিওলকভস্কির নাম করতে হয়। সারাজীবন তিনি আন্তর্গ্রহ যাত্রার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করেন। এমন কি ১৯০৩ সালেই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার উপযোগী একটি রকেট-জাহাজের ড্রয়িং এবং অঙ্কের হিসেবও তিনি প্রকাশ করেন। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে মহাকাশে পৌঁছাতে পারবে এমন একটি রকেটের নক্সাও তিনি বানান।



চিত্র ২২
আধুনিক রকেটের জনক
রবার্ট এইচ্. গডার্ড।
[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

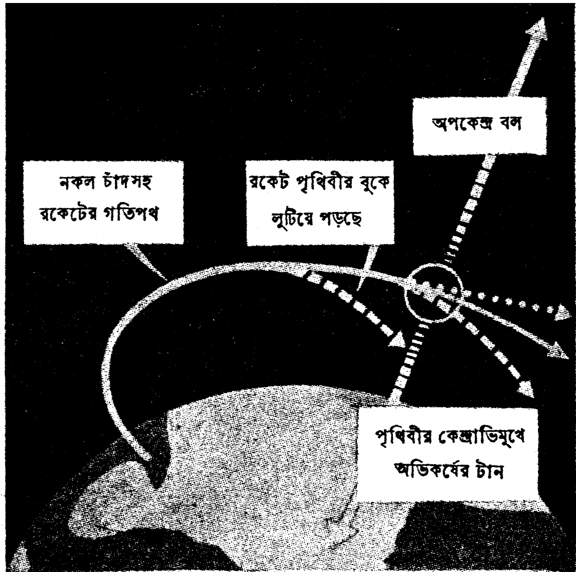
তবে এবিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট এইচ্. গডার্ড-এর। তাঁর ধারণা হ'ল যে, কঠিন জ্বালানির সাহায্যে রকেটকে দ্রুত গতিশীল করা যাবে না। তাই তিনি তরল জ্বালানি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন এবং ১৯২৬ সালে তিনিই সর্বপ্রথম



চিত্র ২৩

গডার্ড এবং তাঁর প্রথম রকেট। ১৯২৬ সালের ১৭ই মার্চ এই রকেটটিই সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। এতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল তরল পেট্রোল এবং তরল অক্সিজেন্।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

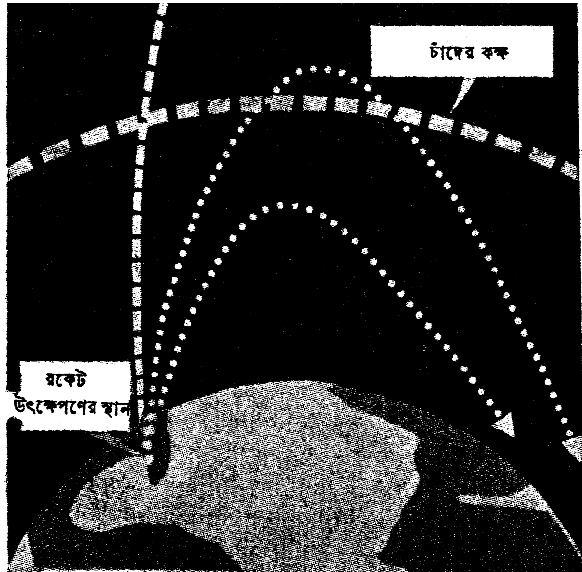


১। অভিকর্ষের টান না থাকলে, রকেটটি একটি সরলরেখা ধরে মহাশূন্যে এগিয়ে যাবে।

২। অভিকর্ষের টান অপকেন্দ্র বলের চেয়ে বেশী হ'লে, রকেটটি পৃথিবীর বুকে লুটিয়ে পড়ছে।

৩। প্রাথমিক বেগ ও কোণ ঠিক হিসেবমতো হ'লে তবেই নকল চাঁদ বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে, নতুবা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকবে।

চিত্র ২৪



১। রকেটটি 'মুক্তিবেগ' অর্জন করলে, অর্থাৎ তার বেগ ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল হ'লে, তা অধিবৃত্তাকার পথে মহাশূন্যে এগিয়ে যাবে।

২। রকেটের বেগ 'মুক্তিবেগ'-এর চেয়ে কম হ'লে তা উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে।

চিত্র ২৫

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

তরল জ্বালানির সাহায্যে রকেট উৎক্ষেপণে সক্ষম হলেন। এতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল তরল পেট্রোল এবং তরল অক্সিজেন। সেই থেকে শুরু হ'ল রকেটের নবযুগ। আর এজন্যই গডার্ডকে বলা হয় আধুনিক রকেটের জনক।

আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে গডার্ড রকেট উৎক্ষেপণে আরও অনেক পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে তরল জ্বালানি ব্যবহার করেন। আজও সবদেশেই রকেট উৎক্ষেপণে তরল জ্বালানি ব্যবহার করার রীতিই প্রচলিত হয়ে আসছে। এছাড়া 'জাইরোস্কোপ'-এর সাহায্যে রকেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিও তিনিই আবিষ্কার করেন। বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যে জাইরোস্কোপ এখনও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে।

রকেট উৎক্ষেপণে আরও বেশী সাফল্যলাভ করেন জার্মান বিজ্ঞানীগণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। এদের নেতা ছিলেন ওয়ার্নার ফন ব্রাউন। প্রধানত এঁরই চেষ্টায় ১৯৪৪ সালে জার্মেনীতে ভি-২ উড়ন্ত বোমার উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়। রকেটের সাহায্য নিয়ে এই বোমা ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০ মাইল উর্ধ্বে উঠতো এবং ২০০ মাইল দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে পারতো।

কিন্তু রকেটের ছোটারও তো একটা সীমা আছে। এক সময় রকেটের জ্বালানি যাবে ফুরিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে রকেটের গতিও যাবে থেমে। কিন্তু মহাকাশে পাড়ি দিতে হ'লে মাঝ-পথে রকেটের গতিবেগ থেমে গেলে তো চলবে না। অনেক ভেবে-চিন্তে বিজ্ঞানীরা এর একটা সুন্দর সমাধান বের করলেন। একটা রকেট একলা হয়তো বেশী দূর যেতে পারবে না, কিন্তু তার উর্ধ্বগতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে তাকে যদি আবার ধাক্কা দেওয়া যায়, তাহলে তা নিশ্চয়ই আরও উপরে উঠে যাবে। এ যেন অনেকটা রিলে রেসের মতো। ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলছি।

তোমরা হয়তো অনেকেই জান যে, স্পোর্ট্‌স্‌-এর সময় একটা বিষয় থাকে, তার নাম রিলে রেস্‌। ধরা যাক, এক এক দলে তিনজন ক'রে প্রতিযোগী আছে, আর এই রকম দল আছে চারটি (বা তারও বেশী)। বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দাগ থেকে চার দলের চারজন 'বেটন' হাতে দৌড় দিল। দ্বিতীয় দাগে পৌঁছে এরা থেমে গেল, কিন্তু এরই মধ্যে প্রত্যেকেই বেটনটা গুঁজে দিল নিজের দলের দ্বিতীয় প্রতিযোগীর হাতে। এবার দ্বিতীয় স্তরের প্রতিযোগীরা ছুটলো বেটন হাতে নিয়ে। তারা আবার তৃতীয় দাগে গিয়ে বেটন দিয়ে দিল তৃতীয় স্তরের প্রতিযোগীদের হাতে। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিযোগীরা থেমে গেল, তাদের বদলে ছুটলো তৃতীয় স্তরের প্রতিযোগীরা। আর তারাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছালো লক্ষ্যস্থলে। অর্থাৎ পুরো পথটা দলের কেউই ছুটলো না, কিন্তু সকলে মিলিয়ে এগিয়ে গেল অনেকটা পথ।

রকেটের বেলায়ও এই রিলে প্রথা অনুসরণ ক'রে বেশ ফল পাওয়া গেল। ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী একটি ভি-২ রকেট মাথায় ক'রে আর একটি ছোট রকেট নিয়ে উপরদিকে উঠলো। জ্বালানি শেষ হ'তেই প্রথম রকেটটি আপনা থেকে খুলে পড়ে গেল। তখন দ্বিতীয় রকেটের যাত্রা শুরু হ'ল। এর ফলে দ্বিতীয় রকেটটি মোট ২৫০ মাইল উপরে উঠতে সক্ষম হ'ল। এর গতিবেগ হ'ল ঘণ্টায় ৫০০ মাইল। বোঝা গেল, কতকগুলো স্বয়ংক্রিয়-যন্ত্রের সাহায্যে যদি পর পর কয়েকবার রকেট জ্বালাবার ব্যবস্থা করা যায়, তবে শেষ রকেটের পাল্লা নিশ্চয়ই আরও অনেক বেড়ে যাবে। এইভাবে বহু পর্যায়ী রকেটের ব্যবহার আরম্ভ হ'ল।

আর একটা কথা। রকেট যখন উপরে উঠতে থাকে, তখন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে তার গতিপথ একটু একটু ক'রে বাঁকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে উপরে উঠে রকেটটি পৃথিবীর সঙ্গে এককেন্দ্রিক বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে পারে। বলা বাহুল্য, এই

ব্যাপারে জাইরোস্কোপ নামক যন্ত্র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। কক্ষপথে পৌঁছাবার পর রকেটের গতিবেগ ঘণ্টায় অন্ততঃ ১৫,৮০০ মাইল হওয়া দরকার, তাহলেই সে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে চাঁদের মতো, পৃথিবীর বুকে লুটিয়ে পড়বে না।

রুশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের হাতে ক্রমে রকেটের আরও উন্নতি হয়েছে। তাই তাঁরা বিরাট বিরাট মহাকাশযান মহাকাশে পাঠাতে পেরেছেন। তাঁদের যান্ত্রিক ব্যবস্থাও এত নিখুঁত যে, ইচ্ছা করলে, সৌরজগতের যে-কোন এলাকায়ই তাঁরা এখন রকেট পাঠাতে পারেন। বেতার-নিয়ন্ত্রণ এবং বেতার-সংযোগ ব্যবস্থাও এত নিখুঁত যে, এই যাত্রাপথে মহাকাশযান থেকে যে-সব বার্তা পাঠানো হয়, সে-সবই তাঁরা নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করতে পারেন। এভাবে পৃথিবীতে বসেই তাঁরা রকেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন, আর সংগ্রহ করেন মহাকাশের কত বিচিত্র বার্তা!

এতকাল সবচেয়ে কঠিন সমস্যা ছিল, মহাকাশযানকে নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা। রুশ এবং মার্কিন বিজ্ঞানীরা সে সমস্যারও সমাধান ক'রে ফেলেছেন। এজন্য দরকার হয়েছে অতি নিখুঁত বেতার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যাতে ইচ্ছা করলেই যে-কোন সময়ে মহাকাশযানকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা যায়। এ বিষয়ে তাঁরা সাফল্যের প্রমাণও দিয়েছেন বার বার।

নামবার সময় উল্টোদিকে রকেট চালিয়ে ব্রেক কষে কষে মহাকাশযানের বেগ ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়। তারপর তা হয়তো জেটপ্লেনের মতোই পাখা মেলে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নেমে আসে। নতুবা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে বেরিয়ে আসে বিরাট এক বা একাধিক প্যারাস্যুট, তখন সেই প্যারাস্যুটে ভর ক'রে মহাকাশযান ধীরে ধীরে নেমে আসে সাগরের জলে।

বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে মহাকাশযানটি যাতে জ্বলে যেতে না পারে সেজন্য তাপ-প্রতিরোধী একরকম জিনিস দিয়ে মহাকাশযানটি আবৃত

ক'রে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা যে কেমন নিখুঁত হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে গাগারিনের বিবৃতি থেকে। তিনি বলেছেন,—"পৃথিবীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ ক'রে মহাকাশযানটি যখন আবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ ক'রল, তখন সেটাকে অগ্নিশিখায় একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। পোর্ট-হোলের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আমি মহাকাশযানের চারিদিকে সে ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখার আভা দেখে নিলাম। আমাকে ঘিরে অগ্নিশিখার পুচ্ছ দুলছে—কিন্তু আমার কেবিনের ভিতরে তাপমাত্রা স্বাভাবিক ছিল।"

জৈব পরিবেশ সৃষ্টি ঃ

পৃথিবীর বাইরে বায়ু নেই, অথচ জীবের শ্বাসক্রিয়ার জন্য বায়ুর অক্সিজেন অপরিহার্য। এজন্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে প্রচুর অক্সিজেন নিয়ে যেতে হবে। আর শ্বাসক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের ক'রে দেবার জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া সেখানে মানুষের কোনো খাদ্য বা পানীয় পাওয়া যাবে না, এজন্য যাত্রীদের সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় দিতে হবে প্রচুর পরিমাণে। এই খাদ্য হবে খুব ঘনীভূত আর শাঁসালো, যাতে তা রাখতে বেশী জায়গা না লাগে।

আর একটা কথা। আমরা যখন পৃথিবীতে থাকি, তখন আমাদের মাথার উপরে থাকে বাতাস, আর এই বাতাস সর্বদাই আমাদের উপর চাপ দেয়। এই চাপের অধীনে থাকতেই আমরা অভ্যস্ত। তাছাড়া এই চাপ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের দেহের মধ্যেই আছে উল্টো চাপ। তাই এই চাপ আমরা কখনও টের পাই না। মহাকাশে বাতাস নেই ব'লে চাপও নেই। কাজেই আমাদের যদি এইরকম পরিবেশে নিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে উপরের চাপ না থাকায়, আমাদের শরীরটা ফুলতে ফুলতে শেষ পর্যন্ত হয়তো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

এইসঙ্গে আমাদের উত্তাপের কথাও ভাবতে হবে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আমাদের লেপ বা কম্বলের মতো ঢেকে রেখেছে—এজন্য আমাদের না সহ্য করতে হচ্ছে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, না অতিরিক্ত গরম। কিন্তু যতই উপরে ওঠা যায়, শীতের তীব্রতা ততই বাড়তে থাকে। আর মহাশূন্যে এই ঠাণ্ডা এত বেশী তীব্র যে, সেখানে আমাদের শরীরটা জমে একেবারে পাথর হয়ে যাবে।

আর একটা কথা। পৃথিবীর উপরে অবিরত মারাত্মক রশ্মির বর্ষণ চলেছে। পৃথিবীর বাইরে বায়ু নেই, অর্থাৎ অনিষ্টকারী মহাজাগতিক রশ্মির বিরুদ্ধে কোন রক্ষাকবচ নেই। সুতরাং এ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।

এসব কথা বিবেচনা করেই বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যাত্রার জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক তৈরি করেছেন, এর নাম 'স্পেস্ স্যুট' বা মহাকাশ-পোশাক। এই পোশাক দেখতে অনেকটা ডুবুরীর পোশাকের মতো। যেমন হাল্‌কা তেমন মজবুত। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে ভিতরের চাপ ও উত্তাপ বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না, কিংবা বাইরের চাপ ও উত্তাপ ভিতরে ঢুকতে পারে না। কোনরকম মারাত্মক রশ্মিও এর মধ্যে ঢুকতে পারে না। এর মাথায় আছে 'হেল্‌মেট' বা শিরস্ত্রাণ। হেল্‌মেটের সামনের দিকটা, অর্থাৎ মুখটা, পাতলা কিন্তু শক্ত বিশেষ ধরনের কাচ দিয়ে তৈরি। এ কাচ ভাঙে না, তাছাড়া সৌরশিখা থেকে মহাকাশচারীর চোখ রক্ষা করে। এই পোশাকের মধ্যেই প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ করার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আবার নিশ্বাসের সঙ্গে যে দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়, তা শোষণ করার জন্য নানা রাসায়নিক দ্রব্যও আছে। এজন্য হেল্‌মেটের অভ্যন্তরের বাতাস সর্বদা তাজা আর গ্রহণের উপযোগী থাকে। পোশাকের মধ্যেই খুদে একটা 'রেডিও রিসিভার' বা বেতার-গ্রাহক এবং একটা 'ট্র্যান্‌সমিটার' বা বেতার-প্রেরক থাকে। এদের সাহায্যেই সঙ্গীদের

সঙ্গে অনায়াসে কথাবার্তা চালানো যায়। চমৎকার জিনিস এই মহাকাশ-পোশাক। এটা প'রে যেখানে খুশি যাওয়া চলে। শুধু হাঁটা-চলা নয়, এটা প'রে অনায়াসে দৌড়-ঝাঁপও করা যায়।

তবে মহাশূন্যে যাবার সময় ত্বরণের প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে ওঠাটাই হ'ল সবচেয়ে বড় সমস্যা। ত্বরণ কাকে বলে? ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলছি।

ধরা যাক, একটা রেলগাড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। এই গাড়িটি চলতে আরম্ভ ক'রলে তার বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। প্রত্যেক সেকেণ্ডেই গাড়ির বেগ একটু একটু ক'রে পরিবর্তিত হবে এবং তারপর হয়তো এক মিনিট পরে তা আবার পূর্ণবেগে চলতে আরম্ভ করবে। এক্ষেত্রে বেগ-পরিবর্তনের হারকে বলা হবে ত্বরণ।

আবার আমরা জানি, কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ, তারই নাম অভিকর্ষ। অভিকর্ষ একটি বল। অভিকর্ষজ বল প্রতিটি বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং কোনো বাধা না থাকলে, প্রতিটি বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে সম-ত্বরণে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান বেগে চলতে থাকে। এরই নাম অভিকর্ষজ ত্বরণ। এর সংকেত হ'ল 'জি' (g)।

গণিতের নিয়ম অনুসারে, রকেট উৎক্ষেপণের সময় ত্বরণ যত বেশী হবে, মহাকাশযাত্রীর ওজনও তত বেড়ে যাবে (কারণ, তার ওজন $w = m \times g$)। এই সময় ত্বরণ সাধারণতঃ ৫ থেকে ৮ 'জি'-র মধ্যে থাকে। ত্বরণ ৫-'জি' হ'লে দেড়মণ ওজনের একজন মানুষ দেহের ভার বোধ করবে প্রায় সাড়ে সাত মণ। বিজ্ঞানীদের অনুমান, গাগারিনের বেলায় ত্বরণের পরিমাপ ছিল ৫-'জি'। তা না হ'লে, গাগারিন নির্দিষ্ট কাজগুলি সব স্বাভাবিকভাবে করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ত্বরণের প্রতিক্রিয়া সহ্য করবার জন্য গাগারিনকে মেঝেতে শুয়ে পা দু'টি মুড়ে চেয়ারের উপরে রাখতে হয়েছিল। কারণ রকেট-উৎক্ষেপণের সময় প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ তাঁকে

মেঝেতে চেপে ধরে। তখন এই অবস্থায়ই তাঁর কষ্ট সবচেয়ে কম হয়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, মহাকাশের যাত্রীকে বিশেষ ধরনের পোশাক পরিয়ে হেলানো আরাম-কেদারায় শুইয়ে রাখলে, তাকে ত্বরণের কুফল থেকে রক্ষা করা যায়।

কক্ষপথে পৌঁছে রকেট যখন ভূ-প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে, তখন কিন্তু অবস্থা অন্য রকম হয়ে যায়। কারণ, তখন মহাকর্ষ বা অভিকর্ষ সবই প্রায় শূন্যতে দাঁড়ায় (এজন্য তখন $g=o$)। এই অবস্থায় কিছুরই ওজন থাকে না (কারণ, $w=m \times g=o$), সব-কিছু শূন্যে ভেসে থাকে। খাদ্যদ্রব্য গলার নালী দিয়ে নীচে নামতে চায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এরূপ বিপর্যয় অনেক দেখা যায়।

গাগারিনকেও এই অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,—"সব-কিছুই আরও সহজেই করা যাচ্ছিল। হাত ও পায়ের কোন ওজন ছিল না। আমি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করি, সব-কিছু পৃথিবীর মতোই হয়েছিল। আমার হাতের লেখা বদলায়নি, যদিও হাতটি ছিল ভারশূন্য। কিন্তু লেখার ব্লকটি ধরে রাখতে হয়েছিল, না হ'লে ব্লকটি শূন্যে ভেসে দূরে চলে যেত।"

মহাশূন্যে বিচরণকালে মার্কিন মহাকাশচারী গর্ডন কুপারের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি লক্ষ্য করেন যে, জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি ফ্লাস্ক থেকে বেরিয়ে ইতস্ততঃ ভাসতে শুরু করেছে। কারণ, সেখানে পার্থিব মাধ্যাকর্ষণের শাসন অনুপস্থিত।

তারপর একসময় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জেগে উঠে তিনি দেখেন যে, তাঁর ওজনবিহীন হাত দু'টো প্রসারিত হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ শূন্যে ভেসে রয়েছে। তারপর থেকেই তিনি, পাছে কোনো নিয়ন্ত্রণ সুইচে হাত লেগে বিপর্যয় ঘটে, সেজন্য হাত দু'টো কাঁধের স্ট্র্যাপের সঙ্গে বেঁধে তবে ঘুমোতেন।

ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা :

মহাশূন্যে ভ্রমণের উপযোগী হওয়ার জন্য প্রতিটি যাত্রীকেই কিন্তু অনেকদিন ধরে ট্রেনিং নিতে হয়। প্রথমে তাকে মহাকাশযানের সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে এবং অস্বস্তিকর একঘেয়েমির মধ্যে থাকবার অভ্যাস করতে হয়। মহাশূন্যের পোশাক এবং সেখানকার উপযোগী খাদ্য ও পানীয়ে অভ্যস্ত হ'তে হয়। এভাবে শিক্ষানবিশীর প্রথম পর্ব শেষ হ'লে তারপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পর্ব। যাত্রীকে তখন অত্যধিক মাধ্যাকর্ষণ (রকেট-উৎক্ষেপণের সময়) এবং ভারশূন্য অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য মহড়া দিতে হয়।

নাগরদোলার মতো বিরাট এক যন্ত্রের মধ্যে একটি হেলানো আরাম-কেদারায় যাত্রীকে বসিয়ে তারপর ঘোরানো হয় বন্ বন্ ক'রে। দেহের উপর মহাকর্ষ ক্রমশ বাড়তে থাকে, হাত-পা ক্রমশ ভারী বোধ হ'তে থাকে। এই অবস্থায়ও তাকে লিভার-টানা, বোতাম-টেপা প্রভৃতি সবরকম কাজ ক'রে যেতে হয়। তারপর হয়তো আস্তে আস্তে বায়ুর চাপ কমিয়ে দেওয়া হ'ল, অর্থাৎ অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া হ'ল। যাত্রীর উপরে এসবের কী প্রতিক্রিয়া হয়, তারই পরীক্ষা চলতে লাগলো।

এরকম ট্রেনিংয়ের সময় একজনকে ২০০ থেকে আরম্ভ ক'রে পরপর পিছনের সংখ্যাগুলি লিখতে বলা হ'ল। সে লিখে চললো—২০০, ১৯৯, ১৯৮ ইত্যাদি। কিন্তু ১৮০তে এসে সে আবার লিখতে লাগলো ১৮১, ১৮২ ইত্যাদি। এর অর্থ এই যে, যাত্রীটি অক্সিজেনের অভাব বোধ করছে, কিন্তু তখনও ইচ্ছাশক্তি হারায়নি।

কিন্তু অন্য একজনের বেলায় দেখা গেল, সে একই কথা বার বার লিখে চলেছে। ক্রমে অক্ষরগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, আঁকা-বাঁকা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। শেষে অনেক চেষ্টা ক'রেও সে আর বাক্যটি শেষ করতে পারছে না। অর্থাৎ সে ক্রমশ ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলছে।

শূন্যলোকে যে ভারশূন্য জীবন যাপন করতে হবে, সে সম্পর্কে পরীক্ষা চালিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ফল পাওয়া গেছে। ১৬ জনকে ৩০-৩৫ সেকেণ্ড পর্যন্ত ভারশূন্য অবস্থায় রেখে দেখা গেছে, ৮ জন সম্পূর্ণ আরামে কাটিয়েছেন। আর ৫ জন মোহাচ্ছন্ন-ভাব অনুভব করেছেন। তাঁদের মনে হয়েছে যে, তাঁরা যেন অতলের দিকে নেমে যাচ্ছেন, অথবা শূন্যে উল্টোভাবে ভেসে বেড়াচ্ছেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বারবার ভারশূন্য অবস্থায় থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে, জীবদেহ ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

মহাকাশের প্রতিটি যাত্রীকেই এভাবে অনেকদিন ধরে ট্রেনিং নিতে হয়। এসব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে তবেই তাঁকে মনোনীত করা হয় মহাকাশের যাত্রী হিসেবে। বলা বাহুল্য, মহাকাশের প্রথম মানুষ-যাত্রী গাগারিনকেও এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়েছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রলোকে অভিযানের পরিকল্পনা

মানুষ চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে অনেকদিন ধরে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাটি সার্থক ক'রে তোলার পথে, অর্থাৎ চাঁদে যাতায়াতের পথ সুগম ক'রে তোলার পথে, আরও কতকগুলি সমস্যা আছে। সেগুলি এখন আলোচনা করছি।

কয়েকটি সমস্যা ঃ

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, একটি ক্রিকেট বলকে উপরদিকে ছুঁড়ে দিতে যে বল দরকার, একটি ভারী পাথরের টুকরোকে সেই সমান উঁচুতে ওঠাতে হ'লে তার চেয়ে অনেক বেশী বল দরকার হয়। অর্থাৎ যে বস্তুর ওজন যত বেশী, তাকে উপরদিকে ওঠাতে হ'লে তত বেশী বলের প্রয়োজন হয়।

রকেটের ওজন বেশী হয় প্রধানত জ্বালানির জন্য। কাজেই জ্বালানির কার্যকারিতা যত বেশী হবে, তত কম জ্বালানি দিয়েই অভিযান শেষ করা যাবে। বিমান চালনার ব্যাপারেও একথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

এতদিন ধরে যে-সব জ্বালানি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি জ্বালানির নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

জ্বালানি	দহন-সহায়ক
১। পেট্রোল	তরল অক্সিজেন
২। কেরোসিন	"
৩। তরল হাইড্রোজেন	"

এদের মধ্যে তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনকেই সবচেয়ে ভালো জ্বালানি বলা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখা যায়

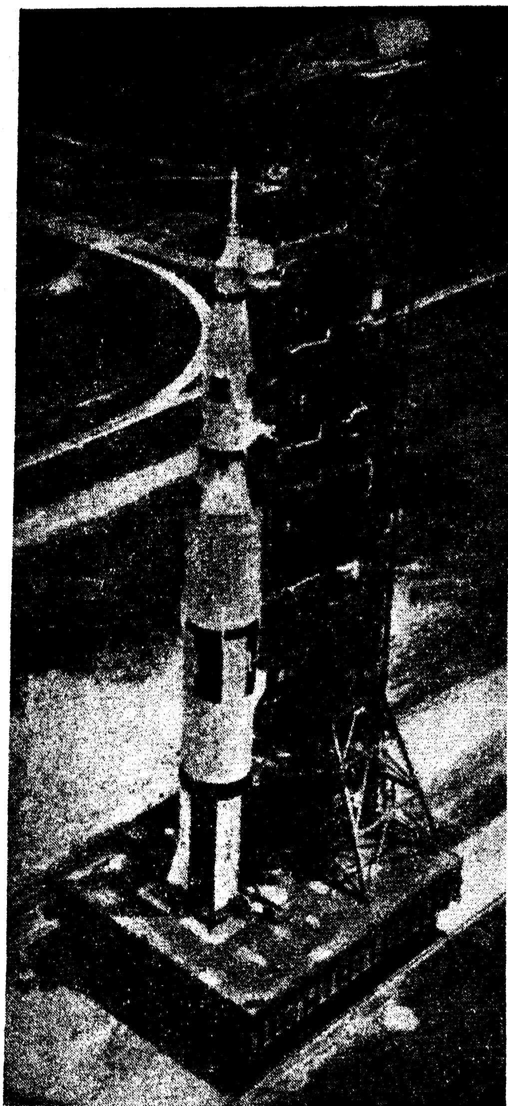
যে, এক টন ওজনের একটি মহাকাশযানের একবার চাঁদে গিয়ে ফিরে আসতে অন্তত ১০০ টন জ্বালানি দরকার হবে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে রকেট, শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন, খাদ্য, পানীয়, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আরো অনেক কিছুর ওজন। মাত্র এক টন ওজনের একটি রকেটে এত জিনিসের স্থান সংকুলান হওয়া খুবই কঠিন।

আর যাত্রাকালে রকেটের ওজন যত বেশী হবে, তাকে উপরদিকে ওঠাতে শক্তির অপচয়ও হবে তত বেশী। এভাবে একটি দুষ্টচক্রের সৃষ্টি হবে। কাজেই যাত্রাকালে রকেটের ওজন যতটা সম্ভব কম রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মহাকাশের স্টেশন থেকে জ্বালানি, অক্সিজেন, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে নূতন ক'রে যাত্রা শুরু করতে পারলে এ সমস্যার খানিকটা সমাধান হবে।

সম্প্রতি অ্যাপোলো-৮ নামক যে মহাকাশযানটি সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে এসেছে, তাতে যে স্যাটার্ন-৫ রকেট ব্যবহার করা হয়, তার মতো শক্তিশালী রকেট আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬৪ ফুট, আর মোট ওজন ৩,০০০ টনেরও বেশী।

স্যাটার্ন-৫ রকেট মূলত তিনটি রকেটের সমাবেশ ; একটির উপর একটি এইভাবে এদের অবস্থান।

প্রথম পর্যায়ের রকেটের দৈর্ঘ্য ৪৮ মিটারের মতো। এর দু'টি জ্বালানি ভাণ্ডারের একটিতে ছিল ৬০০ টন কেরোসিন, অন্যটিতে ১,৬০০ টন তরল অক্সিজেন। উৎক্ষেপণের সময়, রকেটের পাঁচটি এফ-১ ইঞ্জিন একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো, ইঞ্জিনগুলি চালু রইল মাত্র ২ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ড। এতে প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ টন ক'রে কেরোসিন এবং তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ জ্বালানিরূপে খরচ হ'ল, আর মহাকাশযানসহ রকেটকে এক ঠেলায় তুলে দিল ৩৮ মাইল উঁচুতে। তখন তার গতিবেগ দাঁড়াল ঘণ্টায় ৬,০০০ মাইল। প্রথম



চিত্র ২৬। অতি শক্তিশালী স্যাটার্ন রকেট। সকলের উপরে দেখা যাচ্ছে মহাকাশচারীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত 'লঞ্চ এস্‌কেপ্‌ টাওয়ার'। এর নীচেই একটি কুঠুরির মধ্যে রয়েছেন তিন জন মহাকাশচারী।

[ইউ. এস্‌. আই. এস্‌.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁচটি ইঞ্জিন খসে পড়লো।

তারপর রকেটের দ্বিতীয় পর্যায়। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ মিটার, ওজন প্রায় ৫০০ টন। প্রথম পর্যায়ের ইঞ্জিন খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল এবং মহাকাশযানকে তুলে দিল ১০০ মাইলেরও কিছু উপরে এবং তাতে গতিবেগ সঞ্চার ক'রল ঘণ্টায় ১৩,৭৫০ মাইল। এজন্য পাঁচটি জে-২ ইঞ্জিনে ৬ মিনিটের মধ্যেই ৫০০ টন তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ জ্বালানিরূপে খরচ হয়ে গেল।

তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি আরও ছোট—দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ মিটার, ওজন প্রায় ৫ টন। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা খসে পড়লো। এরপর তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু ক'রে দিল একটি মাত্র জে-২ ইঞ্জিন এবং সেই অ্যাপোলো-৮-কে পৃথিবীর উপরে মহাকাশের কক্ষপথে পৌঁছে দিল, শুরু হ'ল পৃথিবী প্রদক্ষিণ। গতিবেগ তখন ঘণ্টায় ১৭,৪০০ মাইল। এইবার তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি নিভিয়ে দেওয়া হ'ল তখনকার মতো।

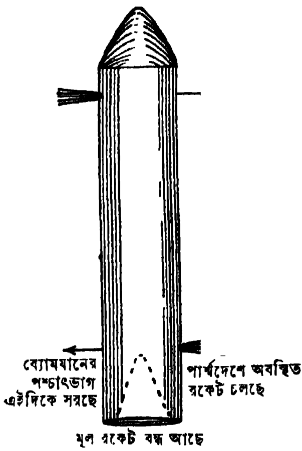
অ্যাপোলো-৮ দুবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রল। তারপর তার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হ'ল চাঁদের দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট-ইঞ্জিন আবার চালু ক'রে দেওয়া হ'ল। এর ফলে অ্যাপোলো-৮-এর গতিবেগ দাঁড়ালো ঘণ্টায় ২৪,৮৫০ মাইল। কিছুক্ষণ পরেই রকেটের ইঞ্জিন নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর থেকে অ্যাপোলো-৮ তার নিজস্ব গতিতে ছুটে চললো চাঁদের দিকে।

এ থেকেই বোঝা যাবে, অ্যাপোলোকে মহাকাশের কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে কী বিশাল রকেট ব্যবহার করা হয়েছে এবং কী বিপুল পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন হয়েছে!

একটা ভরসার কথা এই যে, পৃথিবী থেকে চাঁদে যেতে হ'লে আগাগোড়াই রকেট চালাতে হবে না। চাঁদের দিকে যেতে যেতে

পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রমশ কমবে আর চাঁদের আকর্ষণ ক্রমশ বাড়বে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, চাঁদ থেকে প্রায় ৩০,০০০ মাইল দূরে থাকতেই পৃথিবীর আকর্ষণ একেবারে লোপ পাবে। কাজেই সেখান থেকে চাঁদের আকর্ষণে মহাকাশযানটি আপনা থেকেই চাঁদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে।

কিন্তু চাঁদের কাছে গিয়ে হাজির হ'লেই তো চলবে না। চাঁদে অবতরণ করতে হবে ধীরে ধীরে। নতুবা প্রচণ্ড বেগে ধাবমান রকেট চাঁদের বুকে আছড়ে প'ড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। চাঁদে বায়ু নেই, তাই সেখানে প্যারাসুটের সাহায্যে অবতরণ করা সম্ভব হবে না। এজন্য চাঁদের কাছাকাছি গিয়ে রকেটটি এমনভাবে ঘুরিয়ে দিতে হবে, যাতে তার লেজটি থাকে চাঁদের দিকে। এই অবস্থায় রকেট চালালে ব্রেকের মতো কাজ করবে। কাজেই তখন মহাকাশযানের বেগ ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসবে। এর ফলে মহাকাশযানটি ধীরে ধীরে এবং নির্বিঘ্নে চাঁদে অবতরণ করতে সক্ষম হবে।



চিত্র ২৭
মহাকাশযানের পার্শ্বদেশে অবস্থিত ছোট ছোট রকেট চালিয়ে মহাকাশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

মহাকাশযানটি ঘোরানো যাবে কী ক'রে? এজন্য মহাকাশযানের সম্মুখ এবং পশ্চাৎভাগে আড়াআড়িভাবে আরও কতকগুলি ছোট রকেট বসানো থাকবে। এরূপ একটি রকেট চালালে মহাকাশযানের একপাশ দিয়ে গ্যাস বেরুবে, তখন মহাকাশযানের সেই প্রান্তটি উলটো দিকে সরে যাবে। এভাবে প্রয়োজন অনুসারে

বিভিন্ন রকেট চালিয়ে মহাকাশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

জল, বায়ু এবং খাদ্যের সমস্যা ঃ

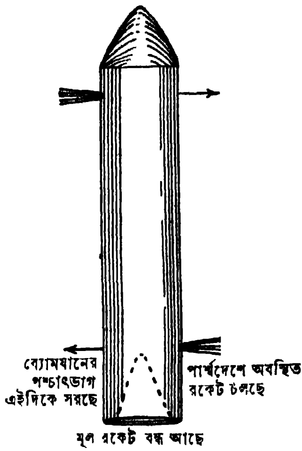
পৃথিবীর বাইরে গেলেই জল, বায়ু এবং খাদ্য কিছুই পাওয়া যাবে না। কাজেই মহাকাশের অভিযাত্রীদের সঙ্গে ক'রে প্রচুর পরিমাণে জল, অক্সিজেন, ঘনীভূত অথচ পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতি সবই নিয়ে যেতে হবে। দৈবাৎ এদের যে-কোন একটির অভাব হ'লেই অভিযাত্রীদের জীবনান্ত হবে পৃথিবীর বাইরে অজ্ঞাত কোনো স্থানে, পৃথিবীর মানুষ হয়তো সেকথা জানতেই পারবে না কোন কালে।

এখন অনেকেই বলেন যে, মহাকাশে অভিযান চালাতে হ'লে, প্রথমে মহাকাশে একটি স্টেশন স্থাপন করতে হবে। তা পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে অবিরাম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। আর মহাকাশে এরূপ একটি স্টেশন স্থাপিত হ'লে সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে এসবের মজুত ভাণ্ডার, যাতে চাঁদে যাওয়ার পথে অভিযাত্রীরা এখান থেকেই এসব প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতে পারেন।

সম্প্রতি একটি খবরে প্রকাশ যে, অতি দ্রুত বর্ধিষ্ণু একপ্রকার সামুদ্রিক আগাছার সন্ধান পাওয়া গেছে, এর নাম ক্লোরেলা। মাত্র একদিনেই এদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার গুণ বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মহাকাশযানের একটি বদ্ধ কামরার মধ্যে এইজাতীয় শেওলা রেখে তার সাহায্যে অভিযাত্রীদের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেনের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, এই শেওলা ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস-মিশ্রিত জল পাম্পের সাহায্যে একটি নলের একদিক থেকে অন্যদিকে পরিচালিত করলে এবং তার উপর সবিরামভাবে পেন্‌সিলের মতো সরু অথচ তীব্র আলোক-রশ্মি ফেললে অঙ্গার-আত্তীকরণের কাজ অতি দ্রুত সম্পাদিত হয়। আলোকপাতের সময় এই শেওলা কার্বন ডাই-

পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রমশ কমবে আর চাঁদের আকর্ষণ ক্রমশ বাড়বে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, চাঁদ থেকে প্রায় ৩০,০০০ মাইল দূরে থাকতেই পৃথিবীর আকর্ষণ একেবারে লোপ পাবে। কাজেই সেখান থেকে চাঁদের আকর্ষণে মহাকাশযানটি আপনা থেকেই চাঁদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে।

কিন্তু চাঁদের কাছে গিয়ে হাজির হ'লেই তো চলবে না। চাঁদে অবতরণ করতে হবে ধীরে ধীরে। নতুবা প্রচণ্ড বেগে ধাবমান রকেট চাঁদের বুকে আছড়ে প'ড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। চাঁদে বায়ু নেই, তাই সেখানে প্যারাস্যুটের সাহায্যে অবতরণ করা সম্ভব হবে না। এজন্য চাঁদের কাছাকাছি গিয়ে রকেটটি এমনভাবে ঘুরিয়ে দিতে হবে, যাতে তার লেজটি থাকে চাঁদের দিকে। এই অবস্থায় রকেট চালালে ব্রেকের মতো কাজ করবে। কাজেই তখন মহাকাশযানের বেগ ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসবে। এর ফলে মহাকাশযানটি ধীরে ধীরে এবং নির্বিঘ্নে চাঁদে অবতরণ করতে সক্ষম হবে।



চিত্র ২৭
মহাকাশযানের পার্শ্বদেশে অবস্থিত ছোট ছোট রকেট চালিয়ে মহাকাশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

মহাকাশযানটি ঘোরানো যাবে কী ক'রে? এজন্য মহাকাশ-যানের সম্মুখ এবং পশ্চাৎভাগে আড়াআড়িভাবে আরও কতকগুলি ছোট রকেট বসানো থাকবে। এরূপ একটি রকেট চালালে মহাকাশযানের একপাশ দিয়ে গ্যাস বেরুবে, তখন মহাকাশযানের সেই প্রান্তটি উলটো দিকে সরে যাবে। এভাবে প্রয়োজন অনুসারে

বিভিন্ন রকেট চালিয়ে মহাকাশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

জল, বায়ু এবং খাদ্যের সমস্যা :

পৃথিবীর বাইরে গেলেই জল, বায়ু এবং খাদ্য কিছুই পাওয়া যাবে না। কাজেই মহাকাশের অভিযাত্রীদের সঙ্গে ক'রে প্রচুর পরিমাণে জল, অক্সিজেন, ঘনীভূত অথচ পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতি সবই নিয়ে যেতে হবে। দৈবাৎ এদের যে-কোন একটির অভাব হ'লেই অভিযাত্রীদের জীবনান্ত হবে পৃথিবীর বাইরে অজ্ঞাত কোনো স্থানে, পৃথিবীর মানুষ হয়তো সেকথা জানতেই পারবে না কোন কালে।

এখন অনেকেই বলেন যে, মহাকাশে অভিযান চালাতে হ'লে, প্রথমে মহাকাশে একটি স্টেশন স্থাপন করতে হবে। তা পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে অবিরাম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। আর মহাকাশে এরূপ একটি স্টেশন স্থাপিত হ'লে সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হবে এসবের মজুত ভাণ্ডার, যাতে চাঁদে যাওয়ার পথে অভিযাত্রীরা এখান থেকেই এসব প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতে পারেন।

সম্প্রতি একটি খবরে প্রকাশ যে, অতি দ্রুত বর্ধিষ্ণু একপ্রকার সামুদ্রিক আগাছার সন্ধান পাওয়া গেছে, এর নাম ক্লোরেলা। মাত্র একদিনেই এদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার গুণ বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মহাকাশযানের একটি বদ্ধ কামরার মধ্যে এইজাতীয় শেওলা রেখে তার সাহায্যে অভিযাত্রীদের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেনের সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা যাবে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, এই শেওলা ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস-মিশ্রিত জল পাম্পের সাহায্যে একটি নলের একদিক থেকে অন্যদিকে পরিচালিত করলে এবং তার উপর সবিরামভাবে পেন্‌সিলের মতো সরু অথচ তীব্র আলোক-রশ্মি ফেললে অঙ্গার-আত্তীকরণের কাজ অতি দ্রুত সম্পাদিত হয়। আলোকপাতের সময় এই শেওলা কার্বন ডাই-

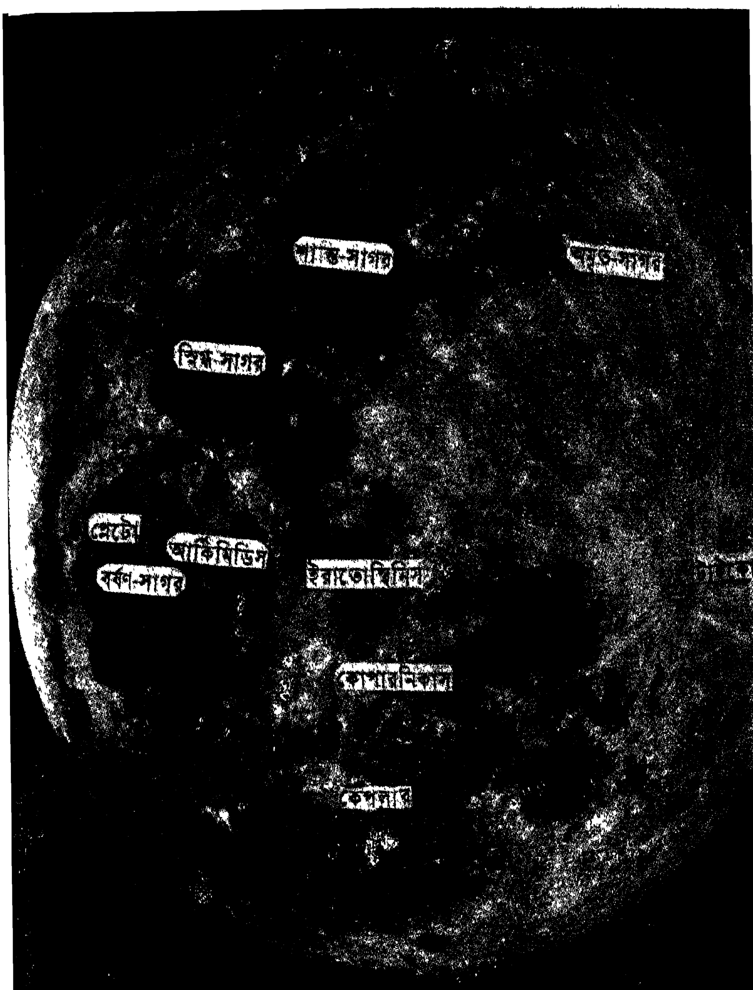
অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ ক'রে তার সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন প্রভৃতি খাদ্য প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। অন্ধকারের সময় এরা বিশ্রাম পায়। এই অবস্থাতেই এদের কার্যকারিতা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে এই শেওলার সাহায্যে বদ্ধ বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস অপসারিত হবে এবং তার পরিবর্তে প্রচুর অক্সিজেন এবং খাদ্য পাওয়া যাবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, মহাকাশ-স্টেশনে যেমন উদ্ভিদের চাষ করা হবে, তেমনি পাশাপাশি কতকগুলি তৃণভোজী প্রাণীও রাখতে হবে। তারা ঐসব উদ্ভিদ্ থেকেই আহার্য সংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকবে এবং অভিযাত্রীদের আরও ভালো আহার্য যোগাবে। তাতে খাদ্যের একঘেয়েমি অনেকটা ঘুচবে। অর্থাৎ কেবিনের মধ্যে পৃথিবীর মতোই একটি জীবন-চক্র চালু করতে হবে। তা না হ'লে চাঁদে গিয়ে নানাপ্রকার অনুসন্ধান কার্য সম্পাদন ক'রে তারপর প্রাণ নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসার আশা করা যায় না।

মহাকাশ-বিজয়ের পথে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে ধাপে ধাপে। মহাশূন্যে যে স্টেশন স্থাপন করা হবে, সেখানে প্রথমে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্ এবং জীব-জন্তুদের নিয়ে গড়ে তুলতে হবে এক নূতন উপনিবেশ। তারপর সমস্ত অবস্থা অনুকূল ব'লে মনে হ'লে, একদিন সুযোগ বুঝে পাড়ি দিতে হবে চাঁদের দিকে, সেখান থেকে অন্য কোন গ্রহে।

চাঁদের দেশে গেলে কী দেখবো?

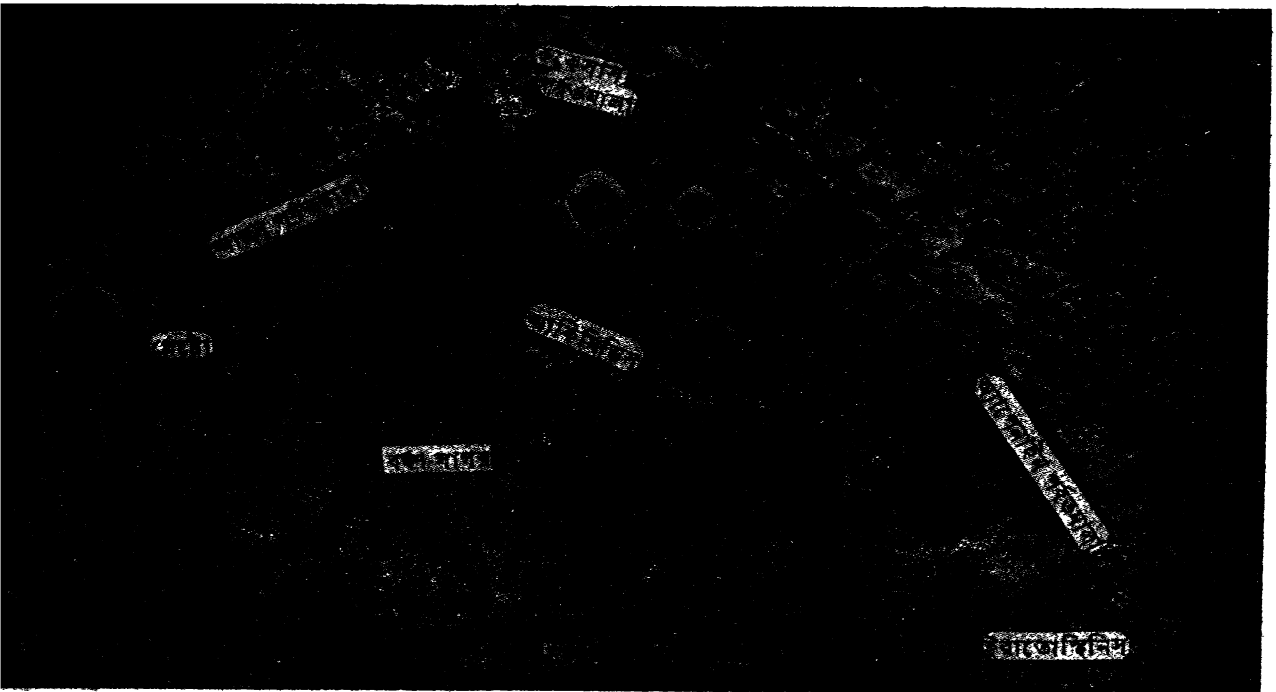
দূর থেকে মনে হয়, চাঁদের একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আছে। কিন্তু এ সৌন্দর্য হ'ল মৃতের মতো পাণ্ডুর ও বিষাদময়। তার কারণ, চাঁদ একটা মরা উপগ্রহ। এতে জল নেই, বাতাস নেই, জীব-জন্তু গাছপালা কিছুই নেই। প্রাণের কোনো চিহ্নও আজ অবধি দেখা যায়নি সেখানে। কোনো প্রকারে চাঁদে গিয়ে হাজির হ'তে পারলে কী দেখা যাবে, তাই এখন আলোচনা করা যাক।



চিত্র ২৮। পূর্ণিমার চাঁদ—পৃথিবী থেকে দূরবীণের সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্র।

বড় বড় কালো ছোপগুলির নাম পর পর দেওয়া হ'ল—অমৃত-সাগর, তার উপরে বাঁদিকে উর্বরতার সাগর, তার বাঁদিকে সংকটের সাগর (গোলাকার), তার নীচে যথাক্রমে শান্ত-সাগর, স্নিগ্ধ-সাগর, বাষ্পের সাগর, বর্ষণ-সাগর ইত্যাদি।

(১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পৃথিবীর দু'জন মানুষসহ 'চাঁদের ভেলা' শান্ত-সাগর অঞ্চলে অবতরণ করে।)



চিত্র ২৯। "মারে ইম্‌ব্রিয়াম" বা বর্ষণ-সাগর

পৃথিবী থেকে খালি চোখে তাকালে চাঁদের গায়ে অনেক কালো কালো ছোপ নজরে পড়ে। এই দেখে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কল্পনা করেছিলেন যে চরকা-বুড়ী একটা গাছের তলায় বসে সুতো কাটছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সব দেশেই চাঁদ সম্পর্কে নানা খেয়ালী কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে চলতি কথা এই যে, চাঁদে দেখা যায় একটা মানুষের মুখ। নাক চোখ আর মুখসুদ্ধ চাঁদের সুন্দর একটা ছবি আঁকা হ'ল; সেই থেকে চাঁদ হ'ল চাঁদমামা।

প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগেকার কথা। ইটালীর বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তাঁর ছোট দূরবীণ দিয়ে চাঁদকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে যান। মর্ত্যের মানুষ তাঁর কাছ থেকেই প্রথম শুনলো যে, চাঁদের গা-টা মোটেই সমতল নয়, উঁচু-নীচু অনেক বড় বড় পাহাড় পর্বত আর গর্তে ভর্তি। আর আছে কতকগুলো বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কালো কালো ছোপ। গ্যালিলিও এগুলিকেই সাগর ব'লে ভুল ক'রেছিলেন এবং এদের সেরকম সব নাম দিয়েছিলেন।

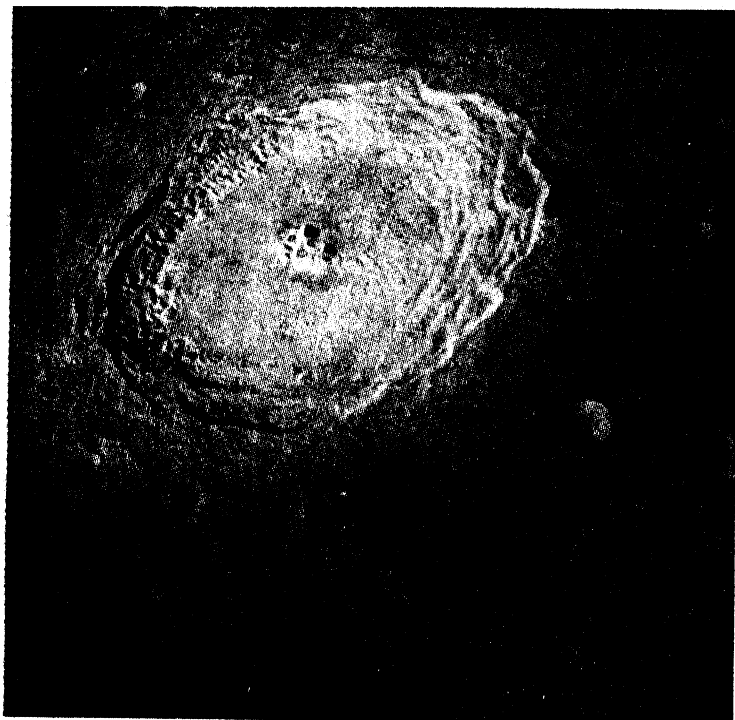


গ্যালিলিও
চিত্র ৩০

বড় বড় ছোপগুলির মূল ল্যাটিন নাম এখানে পর পর দেওয়া হ'ল যেমন—Mare nectaris (অমৃত-সাগর), Mare fecundatatis (উর্বরতার সাগর), Mare crisium (সংকটের সাগর), Mare tranquilitatis (শান্ত-সাগর), Mare serenitatis (স্নিগ্ধ-সাগর), Mare vaporum (বাষ্পের সাগর), Mare imbrium (বর্ষণ-সাগর) ইত্যাদি। ল্যাটিন Mare শব্দের অর্থ হ'ল সাগর। কিন্তু চাঁদে গেলে দেখা যাবে, কালো ছোপগুলো সবই চাঁদের সমভূমি, এসবের কোনটিতেই এক ফোঁটা জল নেই।

আর দেখা যাবে বড় বড় আগ্নেয়গিরির মুখবিবর বা জ্বালামুখ।

অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির আকার পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির মতোই; আংটির মতো উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা খানিকটা গোলাকার সমভূমি, ঠিক যেন এক-একটি প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম। আবার এক-একটির



চিত্র ৩১

চাঁদের বুকে ল্যাংগ্রিনস্ নামক একটি গিরিকেন্দ্রিক গহ্বর। এর ব্যাস প্রায় ১১৫ মাইল (১৮৫ কি. মি.)। (অ্যাপোলো-৮-এর জানালা দিয়ে প্রায় ৭০ মাইল উপর থেকে তোলা আলোকচিত্র)

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

আকার ভারি অদ্ভুত, আগ্নেয়গিরির মুখবিবরের মাঝখানে রয়েছে দীর্ঘ ছুঁচালো টিলা (গিরিকেন্দ্রিক গহ্বর)। এদের প্রত্যেকটার আলাদা নাম, যেমন—গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, টলেমি, কেপ্লার,

প্লেটো, আর্কিমিডিস, টাইকো প্রভৃতি···অধিকাংশের নাম দেওয়া হয়েছে বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সম্মানার্থে।

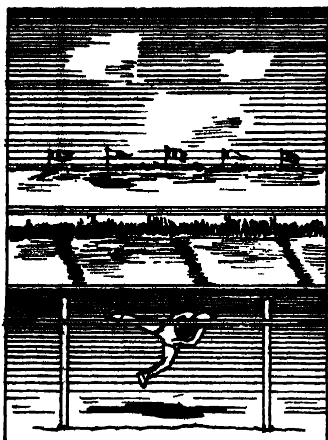
চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে চারিদিকে তাকালে দেখা যাবে, শুধু ধু-ধু বিরস প্রান্তর, কাঁকর আর ধুলোয় ভরা, তার এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে বড় বড় পাথরের চাঁই। জুতো পায়ে কাঁকরের উপর দিয়ে হেঁটে চললেও খচমচ শব্দ হবে না, আর সে শব্দ কেউ শুনতেও পাবে না, কারণ সেখানে বায়ু নেই। তবে চলতে গেলেই ধুলো উড়বে, কিন্তু তা আবার নেমে আস্তে আস্তে বসে যাবে। কারণ, ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করার মতো বাতাস সেখানে নেই।

প্রাণহীন নিস্তব্ধ একটা উপগ্রহ। বাতাস নেই ব'লে সেখানে গলা ছেড়ে চীৎকার করলেও সেই শব্দ পাশের মানুষের কাছেও পৌঁছাবে না। এজন্য অভিযাত্রীদের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে হবে বেতারযন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে শুধু ততদূর পর্যন্তই বেতার কাজ করবে, কারণ চাঁদকে ঘিরে কোনো আয়নমণ্ডল নেই। পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে পর পর কয়েকটি আয়নমণ্ডল, সেখান থেকে ছোট-বড় সব রকম বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। তাই পৃথিবীর যে কোনো স্টেশন থেকে প্রচারিত বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে ধরা যায়। কিন্তু চাঁদে তা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর মতো সেখানেও অবিরত অসংখ্য উল্কাপিণ্ড ঝরে পড়ছে। কিন্তু বাতাস না থাকায় সেখানে উল্কার বিন্দুমাত্র ক্ষয় হ'তে পারে না। কাজেই দেখা যাবে, বিরাট এক-একটা উল্কা ভীমবেগে ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে চাঁদের বুকে, কিন্তু বায়ু না থাকায়, বিস্ফোরণের কোনো শব্দ হবে না। আর তা শোনাও যাবে না দূর থেকে। উল্কার আঘাত এড়িয়ে বেঁচে থাকলে অবশ্য চাঁদের বুকে কান পেতে দূরবর্তী উল্কাপাতের শব্দ-কম্পন অনুভব করা যেতে পারে।

পৃথিবীর চেয়ে চাঁদ অনেকখানি ছোট, তাই পৃথিবীর তুলনায়

চাঁদের মহাকর্ষ ছ'গুণ কম। কাজেই সেখানে গিয়ে শরীরটা হঠাৎ খুব হাল্‌কা ব'লে মনে হবে। পৃথিবীতে যার ওজন ৬০ কিলোগ্রাম, চাঁদে তার ওজন মাত্র ১০ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ ওখানে সবকিছুর ওজন ছ'গুণ কম। পৃথিবীতে কেউ হয়তো ৬ ফুট লাফাতে পারেন, কিন্তু





চিত্র ৩২

পৃথিবীতে একজন মানুষ দেহের ভারকেন্দ্র (৩ ফুট উঁচুতে অবস্থিত) প্রায় ৩ ফুট উঁচুতে তুলতে সক্ষম হয়। কাজেই সে ৩+৩=৬ ফুট লাফাতে পারে। সেই মানুষই চাঁদে গেলে ৩+৩×৬=২১ ফুট লাফাতে পারবে।

চাঁদে গিয়ে তিনিই ২১ ফুট লাফাতে পারবেন।* কাজেই ওখানে গিয়ে ছোটখাটো ঢিবি, ফাটল বা খাদ অনায়াসে লাফিয়ে পার হওয়া যাবে।

দিনের বেলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা যাবে আমাদের চিরচেনা সূর্যদেবকে। পৃথিবী থেকে যেমন দেখা যায় হুবহু তেমনি,

* ধরা যাক, দেহের ভারকেন্দ্র আছে ৩ ফুট উঁচুতে। কাজেই দেহের ভারকেন্দ্র আরও ৩ ফুট উঁচুতে ওঠাতে পারলে ৩+৩=৬ ফুট লাফানো যাবে। অতএব চাঁদে গিয়ে ৩+৩×৬=২১ ফুট লাফানো সম্ভব হবে।

তবে অনেক বেশী উজ্জ্বল। ওখানে বায়ুমণ্ডল নেই ব'লে সূর্যোদয়ে আর সূর্যাস্তে লাল বা গোলাপী রং দেখা যাবে না। চাঁদের আকাশে নানা রঙের মেঘের খেলাও দেখা যাবে না কোনোদিন। বায়ুমণ্ডল না থাকায় এখানে শুধু দু'টো রঙের প্রাধান্য—ঝক্‌ঝকে সাদা আর মিশ্‌মিশে কালো। রোদে সবকিছু ঝক্‌ঝক্ করছে, তারই পাশে ছায়াগুলো মিশ্‌মিশে কালো।

আকাশের চেহারাটা কিন্তু একেবারে আলাদা। আকাশ ঘোর কালো, আর সেই আকাশে তারাগুলো যেন ঝক্‌ঝক্ করছে; প্রখর সূর্যালোকেও এগুলো একটুও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। সবচেয়ে ছোট তারাগুলোও দেখা যাচ্ছে, এমনকি সূর্যগোলকের কাছের তারাগুলোও। পৃথিবীতে বায়ুকণা সূর্যের আলোয় দীপ্ত হয়ে ওঠে ব'লে তারাদের আলো ঝাপ্‌সা ক'রে দেয়, এজন্য দিনের বেলায় তারাগুলোকে দেখাই যায় না। কিন্তু চাঁদে বায়ুকণা নেই, তাই দিনের বেলায়ও সবচেয়ে ম্লান তারাটিকেও দেখা যাবে।

পৃথিবীতে মনে হয়, তারাগুলো সব সময় যেন ঝিক্‌মিক্ করছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখা যাবে, তারাগুলো যেন এক-একটি স্থির উজ্জ্বল আলোর বিন্দু, এত ছোট যে তাদের ব্যাস মাপা যায় না। এর কারণ কী ?

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় হাওয়ার কাঁপন আর ঝিলিমিলি নিশ্চয়ই দেখেছ। ঝিরঝিরে হাওয়ায় মনে হয়, সব জিনিসই কাঁপছে, তাদের বাহির-রেখা একটু একটু বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর উপরে বাতাস কখনও স্থির থাকে না, উত্তাপের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন স্তরে সব সময়ই কিছু না-কিছু পরিবর্তন হয়। তাই তারা থেকে যে আলো আসে তার গতিপথও প্রতিমুহূর্তে বদলে যায়। এর ফলে প্রতিমুহূর্তেই মনে হয়, তারাটি যেন একটু সরে গেল। ছড়িয়ে পড়ে আরো বড় হয়ে গেল, আর সেজন্য একটু ম্লান হয়ে গেল। এজন্য আমাদের চোখে সব সময়ই একটা ঝিকিমিকির

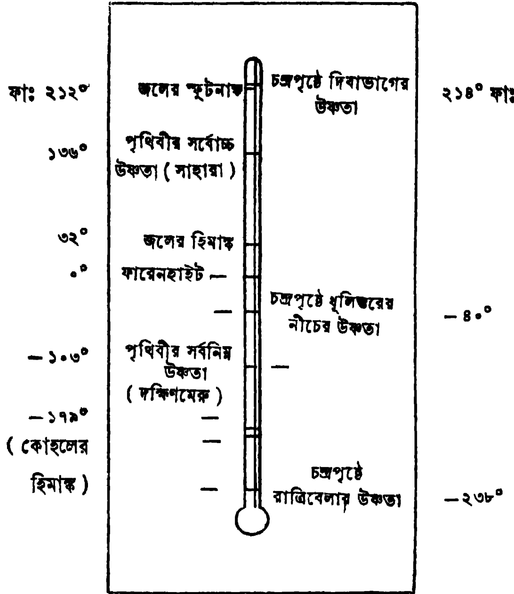
অনুভূতি জাগে। চাঁদে বায়ু নেই ব'লে এরকম কোনো অনুভূতি হওয়া সম্ভব নয়।

আগেই বলেছি, কক্ষপথে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণের সময় চাঁদ নিজের মেরুদণ্ডের উপর একটা মাত্র পাক খায়। কাজেই পৃথিবীতে যে সময়টাকে আমরা বলি চান্দ্র মাস, চাঁদের মানুষ তাকেই বলবে একটা চান্দ্র দিন। সাড়ে উনত্রিশটি পার্থিব দিনে একটি চান্দ্র মাস পূর্ণ হয়। চান্দ্র দিনের দৈর্ঘ্য এরই সমান; আলো-আঁধারে, রাত্রি-দিনে এটি সমানভাবে বিভক্ত। কাজেই সেখানে দিন কিংবা রাত্রির দৈর্ঘ্য ৩৫৪ ঘণ্টা, অর্থাৎ পৃথিবীর এক পক্ষকালের সমান। আর পৃথিবীর গোটা একটা বছর প্রায় তেরোটা চান্দ্র দিনের সমান। অর্থাৎ চাঁদের মানুষ গোটা বছরে মাত্র তেরোটা সূর্যোদয়, অথবা তেরোটা সূর্যাস্ত, দেখতে পাবে।

বায়ুমণ্ডলের রক্ষাকবচ না থাকায় সেখানে সূর্যকিরণের প্রাখর্য অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হবে। উঃ কী ভয়ংকর গরম চাঁদের সূর্যালোকিত দিকটা! দিনের বেলায় চাঁদের মাটি ১০০° সেন্টিগ্রেডের (বা ২১২° ফারেনহাইটের) চেয়েও বেশী গরম হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে সবচেয়ে গরম হয় সাহারা মরুভূমি, কিন্তু সেখানেও উষ্ণতা ৫৮° সেন্টিগ্রেডের (বা ১৩৬° ফারেনহাইটের) চেয়ে বেশী হয় না। কাজেই ওখানে দিনের বেলা বাইরে গেলে কাঠফাটা রোদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ছাতা ব্যবহার করতে হবে।

দিনের বেলায় চাঁদের বুকে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় দেখা যাবে যে, সূর্য অত্যন্ত মন্থরগতিতে, যেন পা টিপে-টিপে, নেমে এসেছে দিগন্তে। অস্তাচলে থাকবে কয়েক ঘণ্টা। ক্রমে সমভূমিতে নেমে আসবে অন্ধকার, কিন্তু আরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দূর পাহাড়ের চূড়াগুলো সূর্যের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করবে। তারপর এক সময় সেগুলোও একেবারে মিলিয়ে যাবে অন্ধকারে। এদিকে উষ্ণতা নামতে নামতে একসময় পৌঁছে যাবে—১৫০° সেন্টিগ্রেডের

(বা —২৩৮° ফারেনহাইটের) নীচে। পৃথিবীতে উষ্ণতা সবচেয়ে নীচে নামে দক্ষিণ মেরুতে, কিন্তু সেখানেও উষ্ণতা —৭৫° সেন্টিগ্রেডের (বা —১০৩° ফারেনহাইটের) নীচে নামে না। বলা বাহুল্য, এত



চিত্র ৩৩

চন্দ্রপৃষ্ঠে উষ্ণতার তারতম্য।

অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ২৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (প্রায় ৪৫০° ফাঃ) উষ্ণতার পার্থক্য সহ্য ক'রে বেঁচে থাকা পৃথিবীর কোনো জীবের পক্ষেই সম্ভব হবে না। কাজেই চাঁদের অভিযাত্রীদের এই দুরন্ত শীতের কামড় সহ্য করার জন্যও সবরকম ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে তারপর চাঁদের দিকে যাত্রা করতে হবে। বলা বাহুল্য, মহাকাশ-পোশাকের ভিতরকার হিটার চালিয়ে দিলেই এরূপ প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে অনায়াসে।

সূর্য অস্ত যেতেই দেখা যাবে, দিগন্তে বেশ নীচুতে আকাশে

ঝুলে রয়েছে বেশ বড় উজ্জ্বল একটা কাস্তের মতো। পৃথিবী থেকে চাঁদকে যেমন দেখা যায়, অবিকল সেইরকম, তবে কয়েকগুণ বড়। এ হ'ল পৃথিবী, চাঁদ থেকে দেখা যাচ্ছে।



চিত্র ৩৪

প্রায় ৩, ৪৩,০০০ কিলোমিটার দূরে চাঁদের কাছাকাছি জায়গা থেকে তোলা পৃথিবীর আলোকচিত্র। ১৯৬৭ সালের ৮ই আগস্ট লুনার অরবিটার-৫ এই ছবিটি তোলে এবং স্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন ব্যবস্থায় তিনদিন পরে তা পাঠিয়ে দেয় মাদ্রিদের (স্পেন) নিকটবর্তী ট্র্যাকিং স্টেশনে। এই ছবিতে ভূমধ্য-সাগর থেকে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত, এবং তুরস্ক, সুয়েজ খাল, আরব দেশ এবং ভারতবর্ষ সব বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

যত সময় কাটবে, পৃথিবীর কাস্তেটা ক্রমশ বড় হ'তে থাকবে, এমনি ক'রে শেষ পর্যন্ত তাকে সম্পূর্ণ গোলাকার একটা থালার মতো দেখাবে। এই হ'ল পূর্ণ-পৃথিবী। তবে চাঁদকে যেমন দেখা যায়, পৃথিবীকে দেখাবে তার চেয়ে আরো অনেক বড় এবং সুন্দর আর প্রায় ৮০ গুণ উজ্জ্বল। পৃথিবীর বুকে উজ্জ্বল সাদা মেঘ, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নীল সমুদ্র এবং বাদামী রঙের জমি সব স্পষ্ট দেখা যাবে। অগণিত নক্ষত্রখচিত অন্ধকার কালো আকাশের গায়ে মৃদু নীলাভ আলোয় উজ্জ্বল চিত্র-বিচিত্র পূর্ণ-পৃথিবী। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! সত্যি প্রাণভরে তারিফ করার মতো দৃশ্য।

এইভাবে পৃথিবীর চেহারা ক্রমশ বদলে যাবে এবং চাঁদের পুরো একটা রাত্রি শেষ হ'তে না হ'তেই পৃথিবীর কলা-পরিবর্তন সব স্পষ্ট দেখা যাবে। তবে চাঁদ থেকে দেখা পৃথিবীকলা হবে চন্দ্রকলার ঠিক উল্টো। অর্থাৎ পৃথিবীতে যখন পূর্ণচন্দ্র দেখা যাবে, চাঁদে তখন পৃথিবীর অমাবস্যা; আবার পৃথিবীতে যখন চাঁদের অমাবস্যা, চাঁদে তখন দেখা যাবে পূর্ণ-পৃথিবী।

আর একটা কথা। চাঁদ থেকে মাঝে মাঝে পৃথিবীর এবং সূর্যের গ্রহণ দেখা যাবে। তবে এদের মধ্যে সূর্য-গ্রহণের দৃশ্যই অধিকতর আকর্ষণীয় ব'লে মনে হবে। পৃথিবীর কালো চাকৃতিটি ধীরে ধীরে সূর্যকে ঢেকে ফেলবে, কিন্তু গোলাকার এবং কালো পৃথিবীর চারিধার দিয়ে দেখা যাবে রক্তিম আলোর এক জ্যোতির্বলয়। পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুমণ্ডল আছে ব'লেই এমন চমকপ্রদ দৃশ্য দেখা সম্ভব হবে।

এরূপ অভিযানের সার্থকতা কী?

মহাকাশে বিচরণের যুগ শুরু হয়েছে। বেশী দিন আর লাগবে না, পৃথিবীর মানুষ মহাকাশযানে ক'রে পৌঁছাবে চাঁদে, সেখান থেকে শুক্র গ্রহে কিংবা মঙ্গল গ্রহে। এবিষয়ে এখন আর কোনো

সন্দেহ নেই যে, আর কয়েক দশকের মধ্যেই সূর্যের অদূরবর্তী মহাকাশ মানুষের আয়ত্তে আসবে।

কিন্তু কী আছে চাঁদে যে প্রাণ হাতে নিয়ে এবং এত কষ্ট সহ্য ক'রে দুঃসাহসী মহাকাশচারীরা বারে বারে মহাকাশের অজানা বিভীষিকার সম্মুখীন হচ্ছেন? চাঁদ তো একটা মরা উপগ্রহ। সেখানে জল নেই, বাতাস নেই, কোনরূপ খাদ্যও নেই। চাঁদ একটা নিস্তব্ধ তুহিন-শীতল বিষণ্ণ মরুভূমি মাত্র। জীব-জন্তু গাছপালা কিছুই নেই সেখানে। চাঁদে গিয়ে বসতি স্থাপন করার কথা কল্পনাও করা যায় না। তবে সেখানে যাবার কিসের এত আগ্রহ?

অ্যাপোলো-৮-এর জানালা দিয়ে চাঁদের জমির দিকে তাকিয়ে বোরম্যান বলেছেন,—"এই বিশাল প্রাণহীন শূন্যতার ক্ষেত্র যেন আগন্তুকদের নামতে বারণ করছে। বাস করবার, কিংবা কাজ করবার পক্ষে এ জায়গাটা যে মোটেই মনোহর নয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।" তবুও কেন এত আগ্রহ?

অনেকেই বলেন, চাঁদে যাওয়ার এই পরিকল্পনা কতকগুলি কল্পনাবিলাসী মানুষের উদ্ভট খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু সত্যই কি এই পরিকল্পনার কোনো সার্থকতা নেই? তাই যদি হবে, তবে বিভিন্ন দেশের নামকরা সব বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আর এই পরিকল্পনা সফল ক'রে তোলার জন্য এত কোটি কোটি টাকাই বা কেন খরচ করা হচ্ছে অকাতরে? এজন্য মনে হয়, এই পরিকল্পনার কিছু সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে।

চাঁদে যাওয়া সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আগ্রহই সবচেয়ে বেশী। কারণ, চাঁদে বায়ু নেই ব'লে সেখান থেকে সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি অনেক বেশী স্পষ্ট দেখা যাবে। কাজেই এর ফলে হয়তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আরো অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের গঠন, গ্রহ-উপগ্রহের উপাদান, সৌর-বাত্যার প্রকৃতি, মহাজাগতিক রশ্মির

স্বরূপ, সৌর শিখার সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে আরও অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য নিশ্চয়ই জানা যাবে। সেখানে গিয়ে সূর্য ও চন্দ্রকে আরো ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। অনেকেরই ধারণা, চাঁদের মাটি পরীক্ষা করলে সৌরজগতের উৎপত্তি এবং বিশেষ ক'রে চন্দ্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিও আরো নির্ভুল ভাবে জানা যাবে। আর এসব নবলব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠবে নূতন নূতন নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব।

চাঁদে বায়ু নেই ব'লে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যেসব উল্কা ঝরে পড়েছে চাঁদের পিঠে, সে-সবই সেখানে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর চারিদিকে বাতাবরণ থাকায় ভূপৃষ্ঠে যে-সব উল্কা এসে পৌঁছায়, তাদের মূল চরিত্রের কোনো হদিস পাবার উপায় নেই। কারণ বায়ুর ঘর্ষণে তাদের অনেকখানি ক্ষয়ে গেছে, গলে গেছে। চাঁদে গিয়ে মূল উল্কাগুলিকে অক্ষত অবস্থায় পরীক্ষা করা যাবে। তাই গ্রহ-গ্রহান্তরের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কেও অনেক নূতন তথ্য জানা যাবে। তা ছাড়া এসব উল্কার মধ্যে হয়তো এমন জৈব পদার্থের সন্ধান মিলবে যা জীবনের সাক্ষ্য বহন ক'রে এনেছে। কাজেই তখন মহাজগতে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কেও হয়তো অনেক বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

চাঁদে অনেক মূল্যবান ধাতু থাকা সম্ভব। তবে ঐসব খনিজ পৃথিবীতে এনে তারপর ধাতু-নিষ্কাশন করার খরচ নিশ্চয়ই পোষাবে না। এজন্য চাঁদেই একটি কারখানা নির্মাণ করতে হবে। তাহলে হয়তো এসব মূল্যবান ধাতুর সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

আর কোন প্রকারে যদি চাঁদে একটা ঘাঁটি স্থাপন করা যায়, তাহ'লে সেখান থেকে পৃথিবীর আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় খবর আরো সহজেই এবং নির্ভুলভাবে জানা যাবে। তাহলে আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা নিশ্চয়ই আরো সহজসাধ্য হবে। আর সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই আরো নির্ভরযোগ্য ব'লে

প্রমাণিত হবে। সবচেয়ে মজা হবে যদি চাঁদে একটি বেতার কিংবা টেলিভিশন প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করা যায়। সেখান থেকে যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে তা আরো সহজেই পৃথিবীর গ্রাহক-যন্ত্রগুলি দ্বারা গৃহীত হ'তে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পৃথিবীর বাইরে না গিয়েও, টেলিভিশনের পর্দায় পৃথিবীর বর্ণময় রূপ-পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যাবে।

চাঁদে যাওয়ার এসব পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন দেশে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তাদের ফলাফল সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করেছে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি তাদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু একদল মানুষ আবার এসবই খুব সন্দেহের চোখে দেখছেন। তাঁদের ধারণা, আপাত-দৃষ্টিতে নির্দোষ এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পরিকল্পনার অন্তরালে চলেছে এক ভয়াবহ মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি।

সামরিক শক্তির সাহায্যে "কম্যুনিজ্‌ম" বা সাম্যবাদ এবং "ক্যাপিটালিজ্‌ম" বা ধনতন্ত্রবাদের প্রাধান্য বিস্তারের কল্পনা ও আয়োজন বন্ধ হয়নি। সামরিক বলে বলীয়ান শ্রেষ্ঠ দু'টি দেশের, অর্থাৎ সোভিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা আজও দূর হয়নি। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষালব্ধ এই সব জ্ঞান সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। আর সেজন্যই হয়তো মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই দু'টি দেশের মধ্যে এমন পড়ি-মরি প্রতিযোগিতা চলেছে। এমন দিন যদি আসে, তবে মানব-সভ্যতার যে কী অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা ধারণা করাও কঠিন।

তবে এজন্য বিজ্ঞানীকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ বিজ্ঞানীর কাজ হ'ল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করা। এগুলির ভাল মন্দ বিচার ক'রে দেখবার কোনো অবকাশ তার থাকে না। এভাবে যেসব জ্ঞান লাভ করা যায় সেগুলির সদ্ব্যবহার করা, কিংবা অপপ্রয়োগ করা, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর

করে মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর। মারাত্মক বিস্ফোরক ডিনামাইট দিয়ে যেমন মানব-সভ্যতার নিদর্শনগুলিকে ভেঙেচুরে নষ্ট ক'রে ফেলা যায়, তেমনি এদিয়ে আবার পাহাড়-পর্বত ভেঙে ফেলে পথ-ঘাট-টানেল প্রভৃতি তৈরি ক'রে মানুষের যাতায়াতের পথও সুগম করা যায়। পরমাণু-বোমার সাহায্যে জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসিমায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা সম্পাদন করা হয়েছিল, সেকথা আমরা জানি। কিন্তু পরমাণু-যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের কথা উপলব্ধি ক'রে এখন সব দেশের বিজ্ঞানীরাই পরমাণু-শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন। তাই যে উন্নততর ও সমৃদ্ধতর জীবনের কথা এখন আমরা কল্পনাও করতে পারি না, তারই বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে পরমাণু-যুগ। এ যুগের নাগরিক হয়ে একে প্রত্যাখ্যান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে কি? তাইতো বলি, এসব পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের অপপ্রয়োগ হবার সম্ভাবনা আছে ব'লেই এসব পরীক্ষা বন্ধ ক'রে দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করা বাতুলতা মাত্র। মানুষকে এগিয়ে চলতে হবে সাধনার দুর্গম পথে, এখনই লাভ-লোকসান হিসেব করতে বসলে তার চলবে না।

কয়েক বছর আগে, মহাকাশ-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিপুল ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করার সময় ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—"বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা কখনও আগে থাকতেই হিসেব নিকেশ ক'রে প্রমাণ করা যায় না। একই কারণে আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণের বেলায়ও তা সম্ভব হয় না। কিন্তু আমরা যদি কোনো শিক্ষা লাভ ক'রে থাকি তা হ'ল এই যে, এইসব আবিষ্কার বা দেশভ্রমণের মূল্য ফিরে পাওয়া যায় উল্লেখযোগ্যভাবে। তাছাড়া এতে প্রমাণ হয় যে, মানুষ বেঁচে আছে, আর তার কৌতূহলের নিবৃত্তি নেই।"

ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছেন,—

"আমরা যে এই দশকের মধ্যেই চাঁদে যেতে চাই এবং অন্যান্য কাজ করতে চাই তার কারণ এ নয় যে এসব কাজ সহজ, কারণ এসব কঠিন, কারণ এই লক্ষ্যই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এবং দক্ষতার প্রয়োগে এবং পরিমাপে সহায়তা করবে।"

আর রেডিয়াম-আবিষ্কর্ত্রী জগদ্বিখ্যাত মহিলা-বিজ্ঞানী মাদাম কুরী কোনো এক সময় বলেছেন,—"দুঃসাহসিক অভিযানের প্রবৃত্তি আমাদের পৃথিবী থেকে আজও মরে যায়নি। যখনই আমার আশেপাশে কোন শক্তি চোখে পড়ে, তখনই সেই অবিনাশী দুঃসাহসী প্রবৃত্তি, যা কৌতূহলের গা ঘেঁষে চলে, তার দেখা পাই··· ।"

মানুষ সত্যসন্ধানী। তার কৌতূহলের যেমন সীমা নেই, তেমনি তার অসাধ্য ব'লেও কিছু নেই। অজানাকে জানবার, অজেয়কে জয় করবার আগ্রহ তার চিরকালের। তাইতো সে মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে বার বার অভিযান চালায় দুর্গম গিরি কান্তার মরু আর দুস্তর পারাবারে, ডুব দেয় সাগরের অতল তলে। চাঁদের বুকেও যে কত রহস্য, কত অমূল্য সম্পদ লুকানো রয়েছে, তা কে জানে? চাঁদে না যাওয়া পর্যন্ত মানুষের সেই কৌতূহলের নিবৃত্তি হবে না। তাইতো মানুষ মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে বার বার মহড়া দিচ্ছে, মহাকাশ-বিজয়ের দুরন্ত আশা নিয়ে। বলা যায় না, এমনি এক সফল অভিযানের ফলেই হয়তো জানা যাবে অনেক নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য, আর তা থেকেই হয়তো মীমাংসা হবে অনেক নূতন নূতন রহস্যের।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ

প্রস্তুতি পর্ব ঃ

১৯৬১ সালে পৃথিবীর মানুষ সর্বপ্রথম মহাকাশ জয় করে। তারপর থেকেই চন্দ্রলোকে অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে জোর প্রস্তুতি চলেছে সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু এজন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার, অনেক তথ্য সংগ্রহ করা দরকার, যাতে মহাকাশের অজানা পথে হঠাৎ কোনো বিপদের সম্মুখীন না হ'তে হয়। এজন্য দুই দেশের মহাকাশচারীরাই মহাকাশে গিয়ে নানারূপ দুরূহ পরীক্ষার মহড়া দিয়েছেন। এরূপ কয়েকটি পরীক্ষার কথা এখানে বলা হ'ল।

১৯৬২ সালের ১১ই আগস্ট, ভারতীয় সময় বেলা দু'টোয়, মেজর আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ মহাকাশ-পরিক্রমায় যাত্রা করেন। ইনি রাশিয়ার তৃতীয় মহাকাশচারী। এঁর মহাকাশযানের নাম—ভোস্তক-৩।

এর পরদিনই ভারতীয় সময় ১টা ৩২ মিনিটে রাশিয়ার চতুর্থ মহাকাশচারী পাভেল পপোভিচ মহাকাশ-পরিক্রমা শুরু করেন। এঁর মহাকাশযানটির নাম—ভোস্তক-৪।

দু'টি মহাকাশযান একই কক্ষপথে পরস্পরের খুব কাছাকাছি কয়েক মাইল ব্যবধানে থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে, এই সংবাদ সারা পৃথিবীতে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কারও কারও মতে, এর ফলে মহাকাশ-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। দুই মহাকাশচারীই পরস্পরের মধ্যে এবং পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

মহাকাশে এই জোটবাঁধা পরিক্রমার দ্বারা এই প্রমাণিত হ'ল যে, চন্দ্রলোকে যেতে জ্বালানি সমস্যা আর রইল না। পৃথিবীর

চারিদিকে প্রদক্ষিণরত মহাকাশযান থেকেই যে চন্দ্রলোকগামী মহাকাশযানে জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না।

১৫ই আগস্ট সোভিয়েত মহাকাশচারীদ্বয় নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। মহাকাশে থাকবার সময় নিকোলায়েভ ৯৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে ৬৩-৬৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে ১৫,০০,০০০ মাইলেরও বেশী পথ (অর্থাৎ তিনবার চাঁদে যাওয়া-আসার বেশী পথ) অতিক্রম করেন এবং পপোভিচ ৭০ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটে ৪৭-৪৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে ১২,৫০,০০০ মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করেন।

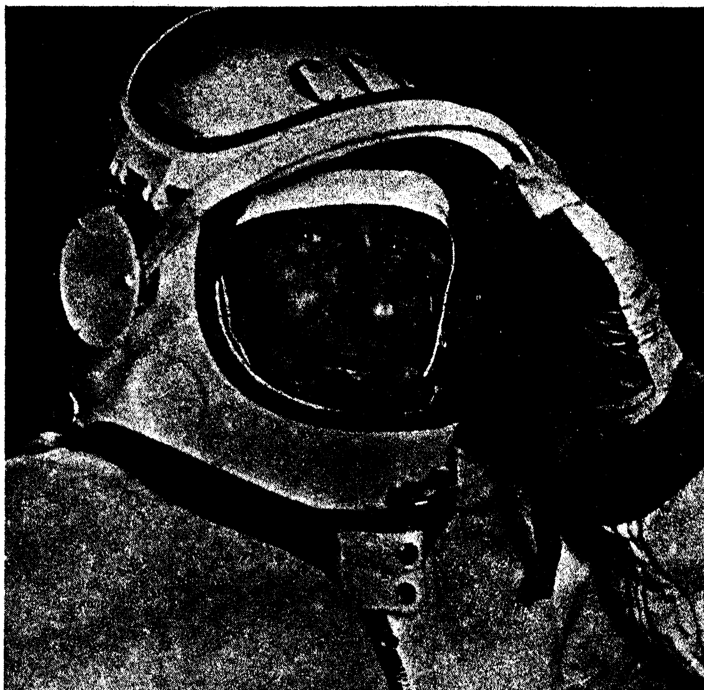
নিকোলায়েভ এবং পপোভিচের মহাকাশ-পরিক্রমার ফলে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হ'ল—(১) চাঁদে যাওয়া-আসার জন্য যে প্রচণ্ড ধকল সহ্য করতে হবে, তা সহ্য করবার শক্তি মানুষের আছে; (২) মহাকাশযান প্রেরণ করার এবং ফিরিয়ে আনবার খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপারে রুশ বিজ্ঞানীরা নিখুঁত সাফল্য অর্জন করেছেন।

বলা বাহুল্য, এর কিছুদিন পরেই মার্কিন মহাকাশচারীরাও অনুরূপ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন।

কিন্তু এরপর রাশিয়ার মহাকাশচারীরা যে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করলেন, তার বিবরণ শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

১৯৬৫ সালের ১৮ই মার্চ, দু'জন সোভিয়েত মহাকাশচারী, বেলিয়েফ ও লিওনোফ, ভোস্কড-২ নামক মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে যাত্রা করলেন। অদ্ভুত এক মহাকাশ-পোশাকে সজ্জিত লিওনোফ বিশ মিনিটের জন্য মহাকাশযানের বাইরে গিয়ে মহাকাশে বিচরণ ক'রে, অর্থাৎ পদচারণা ক'রে এবং ডিগ্‌বাজী খেয়ে, তারপর আবার মহাকাশযানে ফিরে এলেন। ভোস্কডের সঙ্গে সংযুক্ত বন্ধন-রজ্জুটি কোনক্রমে ছিন্ন হয়ে গেলে, তাঁকে 'মানুষ উপগ্রহ' হিসেবে অন্ততঃ দু'সপ্তাহ ধরে সেই কক্ষপথে পাক খেতে

হ'ত। আর এভাবে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘনস্তরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই লিওনোফ একটা উল্কার মতো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতেন। এই দুঃসাহসিক অভিযান শেষ হ'লে

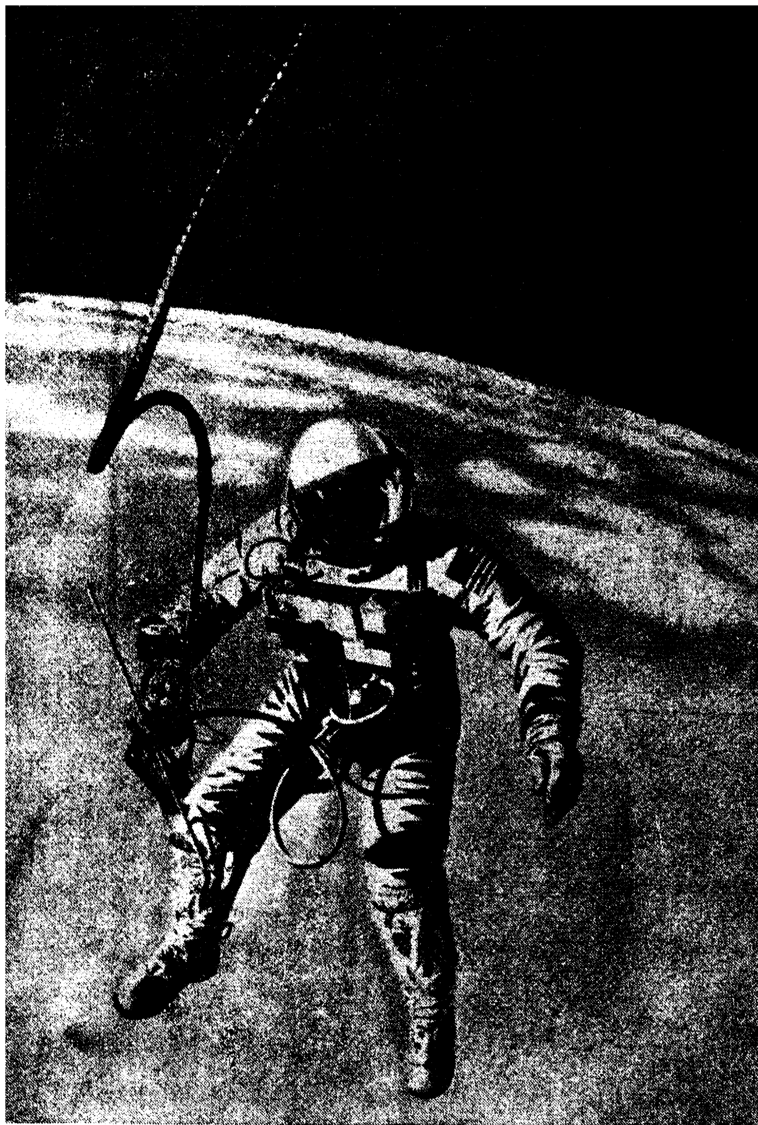


চিত্র ৩৫। রুশ মহাকাশচারী আলেক্‌সাই লিওনোফ—পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি মহাকাশে পদচারণার গৌরব অর্জন করেন (ভোস্কড-২, মার্চ, ১৯৬৫)।

['সোভিয়েত দেশ' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত]

লিওনোফকে নিয়ে বেলিয়েফ ভোস্কড-২ চালিয়ে ১৯শে মার্চ নিরাপদে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এলেন।

এরপর যিনি মহাকাশে বিচরণ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি হলেন মার্কিন মহাকাশচারী মেজর হোয়াইট। ১৯৬৫ সালের ৩রা জুন মেজর ম্যাক্‌ডিভিট এবং মেজর হোয়াইট জেমিনি-৪ নামক



চিত্র ৩৬। এডওয়ার্ড হোয়াইট—মার্কিন মহাকাশচারীদের মধ্যে ইনিই প্রথম মহাকাশে পদচারণার গৌরব অর্জন করেন (জেমিনি-৪, জুন, ১৯৬৫)।
[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে যাত্রা করেন। মহাকাশযানটি যখন প্রশান্ত মহাসাগরের ১৫০ মাইল উপরে, তখন হোয়াইট হামাগুঁড়ি দিয়ে মহাকাশযান থেকে মহাকাশে বেরিয়ে গেলেন এবং বিশ মিনিট ধরে মহাকাশে বিচরণ করলেন। মহাশূন্যে ভাসমান থাকা-কালে হোয়াইট মহাকাশযানের সঙ্গে ২৫ ফুট দীর্ঘ একটি স্বর্ণ-রজ্জু-দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন। মহাশূন্যে বিচরণশীল অবস্থাতেও হোয়াইট মহাকাশযানের চালক ম্যাকৃডিভিটের সঙ্গে কথাবার্তা চালান। ক্রমাগত চারদিন ধরে কক্ষ পরিক্রমার পর তাঁরা আবার নিরাপদে অতলান্তিক মহাসাগরে নেমে আসেন।

মহাকাশে স্টেশন স্থাপনের মহড়া ঃ

বিজ্ঞানীরা অনেকেই বলেন, চন্দ্রলোকে যাতায়াতের পথ সুগম ক'রে তুলতে হ'লে, প্রথমে পৃথিবীর চারিদিকে ঘূর্ণায়মান একটি নকল চাঁদকে কক্ষপথে স্থাপন করতে হবে। আর সেই নকল চাঁদটিই হবে সম্ভাব্য ব্যোম-পথের প্রথম স্টেশন।

দূরপাল্লার রেল-ইঞ্জিন তার চলার পথের সবটা কয়লা ও জল একসঙ্গে নিতে পারে না। পথের ধারে এক-একটি স্টেশনে থেমে নূতন ক'রে কয়লা ও জল নেয়, তাই সে অনায়াসে চলতে পারে শত শত মাইল দূরের পথ। একটি বিমানও তার চলার পথে সবটা তেল একসঙ্গে নেয় না। মাঝে মাঝে এক-একটি বিমান বন্দরে নেমে এসে তেল নিয়ে নেয়, তাই সেও অনায়াসে উড়ে চলে যায় হাজার হাজার মাইল। তেমনি মহাশূন্যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যে মহাকাশযান ব্যবহার করা হবে, তাও সবটা জ্বালানি একবারে নেবে না। পৃথিবী থেকে প্রেরিত মহাকাশযান মহাকাশ-স্টেশনে পৌঁছে নূতন জ্বালানি নিয়ে, নূতন ক'রে শক্তি আহরণ ক'রে, নূতন উদ্যমে পাড়ি দেবে মহাকাশের অন্য কোনো স্টেশনের দিকে, যেমন —চাঁদের দিকে।

এখন প্রশ্ন, মহাকাশে এই স্টেশন স্থাপন করা যাবে কী ক'রে?

বিজ্ঞানীদের ধারণা, রকেটের সাহায্যে যেভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে, একেও হয়তো সেইভাবেই কক্ষপথে স্থাপন করা যাবে। এইভাবে গোটা একটা স্টেশন হয়তো একবারে তার কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হবে না। তবে এরূপ একটি স্টেশনের টুকরো টুকরো অংশ মহাকাশে নিয়ে গিয়ে তাদের জুড়ে জুড়ে একটা স্টেশন গড়ে তোলার কাজ একেবারে অসম্ভব ব'লে মনে হয় না। এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তাতে এই সম্ভাবনাটাই খুব বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এদিকে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন রাশিয়ার মহাকাশচারীরা ১৯৬৯ সালে। ১৫ই জানুয়ারী সোয়ুজ-৪ ভ্লাদিমির সাতালোফসহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর সোয়ুজ-৫ নামক আর একটি মহাকাশযান মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হ'ল। এর মধ্যে ছিলেন তিনজন মহাকাশচারী—বোরিস ভোলিনোফ (অধিনায়ক), আলেক্সাই ইয়েলিসেইয়েফ এবং ইয়েভ্গেনি খ্রুনোফ। মহাকাশযান ছু'টি পৃথিবীর ১২৫ থেকে ১৪৫ মাইল উপরে পরস্পরের কাছাকাছি থেকে কক্ষ পরিক্রমা করতে লাগলো।

এইভাবে চব্বিশ ঘণ্টা উড়বার পর সোয়ুজ-৪ এবং সোয়ুজ-৫ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'ল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটলো ১৬ই জানুয়ারী, ভারতীয় সময় বেলা ২টা ২০ মিনিটে।

সেদিন মস্কোর অগণিত নরনারী টেলিভিশনে এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ ক'রল। টেলিভিশনের পর্দায় প্রথমে মহাকাশযানকে দেখা গেল একটি বিন্দুর মতো। ক্রমশ তা বড় হ'তে লাগলো। একজন মহাকাশচারীর গলা শোনা গেল,—"জারিয়া, আমি বৈকাল (সোয়ুজ-৫-এর সাংকেতিক নাম)।" ছু'টি মহাকাশযানের মধ্যে দূরত্ব তখন মাত্র ৪০ মিটার।

ভূ-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে খবর এল,—"আমি মিলনের অনুমতি দিচ্ছি।"

এরপর টেলিভিশনের পর্দায় সোয়ুজ-৫-এর আকার ক্রমশ বড় হ'তে লাগলো, ক্রমে তার ডানা দু'টি স্পষ্ট দেখা যেতে লাগলো। মনে হচ্ছিল, সোয়ুজ-৫ যেন ক্রমশ দর্শকের দিকেই এগিয়ে আসছে।

সোয়ুজ-৫ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সোয়ুজ-৪-এর সঙ্গে মিলিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে সোয়ুজ-৪-এর অধিনায়ক সাতালোফ বলে উঠলেন,—"সবকিছু চমৎকার!"

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি হর্ষোৎফুল্ল স্বর শোনা গেল,—"সবকিছু স্বাভাবিক! সবকিছু চমৎকার!"

সাতালোফ চীৎকার ক'রে উঠলেন,—"সোজাসুজি ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, যেখানে লক্ষ্য স্থির করেছিলাম।"

"স্বাগতম্, বৈকাল।"

"স্বাগতম্, আমুর (সোয়ুজ-৪-এর সাংকেতিক নাম)।" এরপর শুরু হ'ল একটি যান থেকে উন্মুক্ত মহাকাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অন্য যানে প্রবেশ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষার মহড়া।

সোয়ুজ-এর ভেতরটা এমন ছিল যে, সেখানে মহাকাশ-পোশাক না প'রেই অনায়াসে থাকা যায়। উন্মুক্ত মহাকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ইয়েলিসেইয়েফ ও খ্রুনোফ চলে গেলেন আর একটি কামরায় —যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অরবিট্যাল কম্পার্টমেণ্ট' বা কক্ষপথের কামরা। সেখানে গিয়ে তাঁরা মহাকাশ-পোশাক প'রে নিলেন এবং বেরুবার পথটি ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে অধিনায়ককে জানালেন,—"এবার আমরা যাচ্ছি।"

কেবিন এবং ঐ বিশেষ কামরার মাঝের দরজাটি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। দরজার ওপাশে রইলেন অধিনায়ক ভোলিনোফ, আর এপাশে রইলেন অন্য দু'জন মহাকাশচারী। এইবার এই কামরার ভিতরের চাপ বাইরের চাপের সমান ক'রে নেওয়া হ'ল।

মহাকাশ-পোশাকের ভিতরের চাপ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় রেখে দেওয়া হ'ল, যাতে তা মহাকাশচারীর স্বাস্থ্য বিপন্ন না করে, আর তার চলাফেরা ব্যাহত না হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, মহাকাশ-পোশাকের ভিতরের ও বাইরের চাপে বেশী পার্থক্য ঘটলে পোশাকটি ফুলে ফুটবলের মতো হয়ে যেতে পারে এবং চলাফেরা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। আবার মহাকাশ-পোশাকের মধ্যে চাপ খুব কম হয়ে গেলে রক্ত ফুটতে আরম্ভ করবে, তখন মৃত্যু অনিবার্য।

এইবার বেরুবার পথটি খুলে গেল, আর সেখান দিয়ে মহাকাশ-চারীরা একে একে বেরিয়ে এলেন। মহাকাশ-পোশাকের নানা জায়গা জুড়ে নানা যন্ত্র, পোশাকটি যেন ছোটখাট একটি যন্ত্রাগার। কোনটি শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, কোনটি বা পোশাকের ভিতরকার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করছে।

মহাকাশ-পোশাকের স্থিতিস্থাপক চামড়া তৈরি হয়েছে খুব মজবুত মালমসলা দিয়ে। পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয়, এরকম বিশেষ কাচ লাগানো শিরস্ত্রাণ তাঁরা পরেছিলেন—এটি সৌরশিখা থেকে তাঁদের চোখ রক্ষা করছিল। পোশাকের জোড়গুলো এমন ছিল যে, মহাকাশচারীরা অবাধে চলাফেরা করতে পারছিলেন, কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না।

মহাকাশযানের বাইরে আসার পরেও কিন্তু তাদের সঙ্গে অধিনায়কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল না, তাদের পোশাকের সঙ্গে মহাকাশযানের তারের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রইল। এই তারের ভিতর দিয়েই পোশাকরূপী এবং মানবদেহরূপী যন্ত্রাগারের সব খবর অধিনায়কের কাছে পৌঁছাতে লাগলো। তারপর সেখান থেকে চলে এল পৃথিবীতে ডাক্তারদের কাছে। ওঁদের হৃদ্‌পিণ্ড কেমন কাজ করছে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা, এবং সব চাইতে বড় কথা, ওঁদের মনে কোনো ভয় বা উদ্বেগ দেখা

দিচ্ছে কিনা, সব খবরই পৌঁছাতে লাগলো পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে।

দু'জন অধিনায়কই টেলিভিশন-ক্যামেরা তাক ক'রে রাখলেন বাইরে ওঁদের দিকে, ওঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। পৃথিবীর মানুষও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখতে লাগলো ওঁদের শূন্যে ভেসে চলার সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য।

এই অভিযান সম্পর্কে ইয়েলিসেইয়েফ বলেছেন,—"সোয়ুজ-৫ থেকে বাইরে পা বাড়িয়ে দেখতে পেলাম, আকাশে সূচীভেদ্য অন্ধকার, তার মধ্যে বাদামী রঙের পৃথিবীর অর্ধেকটা মেঘে ঢাকা। এই পটভূমিকায় মহাকাশযানটিকে এমন সাদা দেখাচ্ছিল যে, চোখ ঝলসে যায়।"

কর্মসূচী অনুযায়ী উন্মুক্ত আকাশে তৎপরতা শেষ করার পর ওঁরা সোয়ুজ-৪-এর বিশেষ কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন ঐ কামরার মধ্যেকার চাপ বাইরের চাপের সমান ক'রে দেওয়া হয়েছিল, আর প্রবেশপথের ঢাকনা খুলে দেওয়া হয়েছিল। কামরার মধ্যে প্রবেশ করার পর ঢাকনাটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল, এবং পোশাকের ও কামরার চাপ আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা হ'ল। এরপর পোশাক খুলে তাঁরা দরজার ভিতর দিয়ে কেবিনে প্রবেশ করলেন।

এসম্পর্কে অধিনায়ক সাতালোফ পরে বলেছেন,—"মহাকাশযানের ঢাকনা খুলে ওঁরা আসছেন দেখতে পেয়ে আমিও আমার কেবিনের কবাটের উপর লিখে রাখলাম—স্বাগতম্।"

মহাকাশযান দু'টি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রল। তারপর তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

এ সম্পর্কে খ্রুনোফ বলেছেন,—"মহাকাশযানটি বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে আসার ঠিক আগে ভোলিনোফকে বললাম,—এবার তুমি

একলা রইলে, আবার দেখা হবে পৃথিবীতে। তোমার নিরাপদ অবতরণ কামনা করছি।”

অভিযান শেষে তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে সোয়ুজ-৪ নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে নেমে এল। আর সোয়ুজ-৫ একলাই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। তারপর ১৮ই জানুয়ারী সোয়ুজ-৫-ও নিরাপদে পৃথিবীতে নেমে এল।

এই সর্বপ্রথম মহাকাশে মনুষ্যবাহী দু'টি মহাকাশযানের মধ্যে এক ঐতিহাসিক মিলন ঘটলো। কারণ, চার ও পাঁচ নম্বর সোয়ুজ একত্র হয়ে পরীক্ষামূলকভাবে একটি যন্ত্রঘাঁটি স্থাপন ক'রল। এতে শুধু চালক-বদলই নয়, মহাকাশ থেকে মহাকাশচারীকে উদ্ধার করা, কলকব্জা জোড়া দেওয়া বা মেরামতির কাজে দল বেঁধে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা খুলে গেল।

এই অভিযান সম্পর্কে সাতালোফ বলেছেন,—“আমাদের এই পর্যটন আরও উন্নত ও বিচিত্র পরীক্ষার পথ খুলে দিয়েছে। ভাবী-কালে এ ধরনের স্বল্পস্থায়ী পর্যটনের আর কোনো আকর্ষণই থাকবে না।

অবশ্য, ভাবীকালে আরো বেশী সংখ্যক মহাকাশযান এইভাবে মিলিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগার তৈরি করবে। সেগুলিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার কোনো অর্থ নেই। বরং মহাকাশচারীরা পালা ক'রে সেখানে যাবেন, আসবেন।”

কাজেই মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো এরূপ একটি মহাকাশ-স্টেশন স্থাপন করা সম্ভব হবে। আর তা যদি হয়, তাহ'লে ইচ্ছামত সেখানে যাতায়াত করা কিছুই কঠিন হবে না। এজন্য ছোটখাট রকেট ব্যবহার করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা এই রকেটে ক'রে মহাকাশ-স্টেশনে উঠে যাবেন। তারপর কাজকর্ম সারা হ'লে আবার নেমে আসবেন পৃথিবীতে। তবে ভ্রাম্যমাণ ঐ স্টেশনের সঙ্গে সঙ্গে সব-কিছুই ঘণ্টায় ১৫,৮০০

মাইল বা তারও বেশী বেগে ছুটে চলবে। কাজেই তখন এই রকেটটি যেদিকে ছুটে চলেছে তার বিপরীত দিকে রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে এর গতিবেগ কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে। তাহ'লেই অভিকর্ষের টানে এই রকেটটি চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে থাকবে। এভাবে পৃথিবীর ৫০ মাইলের মধ্যে এসে, অপেক্ষাকৃত ঘন বায়ুস্তরে প্রবেশ করার আগেই, তার বেগ আরো কমিয়ে দিতে হবে। তাহ'লেই সে একটি জেট-প্লেনের মতো নির্বিঘ্নে নেমে আসতে পারবে।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, মহাশূন্যের এই ঘাঁটিতে বসে আকাশের বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটন করা অনেক সহজ হবে। যতক্ষণে পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপর একবার মাত্র পাক খায়, সেই সময়ের মধ্যে এই স্টেশনটি ১২ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। কাজেই পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে, তা মহাশূন্যের ঘাঁটি থেকে সব সময় অতি সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যাবে। আর একটা কথা। স্টেশনটি বায়ুমণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে বিচরণ করবে। কাজেই এখান থেকে গ্রহ-উপগ্রহগুলি আরও অনেক স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। সুতরাং এখান থেকে গ্রহ-উপগ্রহ পর্যবেক্ষণের কাজ অনেক সুচারুরূপে সম্পাদন করা যাবে। তাছাড়া এরূপ একটি স্টেশন স্থাপন করা যদি সত্যসত্যই সম্ভব হয়, তবে সেখান থেকে চন্দ্রলোকে যাতায়াত করা যে আরো অনেক সহজ হবে, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

মনুষ্যবিহীন মহাকাশযানের চন্দ্র প্রদক্ষিণ ঃ

মহাকাশযানে ক'রে চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে আসার উদ্দেশ্যে দু'দেশেই জোর প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন ধরেই, তবে এ বিষয়ে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরাই প্রথম কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেন।

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রুশ বিজ্ঞানীরা জোণ্ড-৫ নামক নানাপ্রকার যন্ত্র-সম্বলিত এক মহাকাশযানকে সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপ করলেন চাঁদের দিকে। তারপর চাঁদের চারিদিকে প্রদক্ষিণ

করিয়ে তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। এই মহাকাশযানটি ভারত মহাসাগরের একটি পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে নির্বিঘ্নে অবতরণ করে। একটা সোভিয়েত জাহাজ সেখানে টহল দিচ্ছিল। জোণ্ড-৫-কে এই জাহাজে তুলে প্রথমে বোম্বাইয়ে আনা হয়। সেখান থেকে একটি বিমানে ক'রে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রাশিয়ায়।

এই খবরে সারা বিশ্বে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, মানুষের পক্ষে চাঁদে অভিযান চালানো সম্ভবপর হবে অদূর ভবিষ্যতেই।

কিন্তু এর অল্পদিন পরেই মার্কিন মহাকাশচারীরা যে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করলেন তা পূর্বেকার সকল কৃতিত্বের রেকর্ডকেই ম্লান করে দিল। সে সম্পর্কেই এখন বলছি।

পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণঃ

১৯৬৮ সালের বড়দিনের সবচেয়ে বড় খবর, মানুষ চন্দ্র জয় করেছে, মহাকাশে গিয়ে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেছে, তারপর নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছে মাটির পৃথিবীতে।

শনিবার, ২১শে ডিসেম্বর, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ২১ মিনিটে আমেরিকার কেপ্ কেনেডি থেকে অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানসহ ৩৬৪ ফুট উঁচু স্যাটার্ন রকেটটি পৃথিবীর মাটি ছেড়ে উঠলো। সূর্যকে সাক্ষী রেখে চাঁদকে সাত পাকে বাঁধবে ব'লে তিনটি মানব-সন্তান যাত্রা ক'রল পৃথিবী ছাড়িয়ে সেই চিরন্তন স্বপ্নের রাজ্যে। দুঃসাহসী এই তিন মহাকাশচারীর নাম ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান (অধিনায়ক), জেমস এ. লোভেল এবং উইলিয়াম এ. অ্যাণ্ডার্স।

১০০ মাইলেরও কিছু উপরে উঠে অ্যাপোলো-৮ যখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু ক'রল, তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭,৪০০ মাইল।

মহাকাশচারীরা দু'বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন। এ সময়ের মধ্যেই তাঁরা যন্ত্রপাতিগুলি সব ভাল করে দেখে নিলেন। সব কিছু

ঠিকমত কাজ করায়, পৃথিবী থেকে যাত্রার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে এবং ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ১২ মিনিটে, ভূ-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে নির্দেশ গেল,—"এবার ছুটে চলো চাঁদের দিকে।"



চিত্র ৩৭

অ্যাপোলো-৮-এর অভিযাত্রিগণ।

ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান (অধিনায়ক), জেম্স এ. লোভেল, উইলিয়াম এ. অ্যাণ্ডার্স।

পৃথিবীর অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করতে হ'লে মহাকাশযানের গতিবেগ হওয়া দরকার ঘণ্টায় প্রায় ২৫,০০০ মাইল। তাই রকেটের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল চাঁদের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে রকেট-ইঞ্জিনটি চালু করে দেওয়া হ'ল। এর ফলে মহাকাশযানের গতিবেগ দাঁড়ালো ঘণ্টায় ২৪,৮৫০ মাইল। কিছুক্ষণ পরেই রকেট-ইঞ্জিন নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর থেকে মহাকাশযান তার নিজস্ব গতিতে ছুটে চললো চাঁদের দিকে।

দুঃসাহসী তিন মহাকাশচারী মহাকাশে তাঁদের পথ খুঁজে নিয়ে যাত্রা করলেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এক অজানা পথে, যে পথে এর

আগে মানুষ কোনদিন পা বাড়ায় নি। তাঁদের লক্ষ্য, প্রায় ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মাইল দূরবর্তী মোহময় চাঁদ, যে তাকে আবহমান কাল ধরে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এইভাবে পৃথিবীর অভিকর্ষের বিরুদ্ধে তাঁরা যত এগিয়ে চললেন, মহাকাশযানের গতিবেগও তত কমতে লাগলো। চলতে চলতে সোমবার রাত্রে ভারতীয় সময় ১টা ৫৯ মিনিটে, তাঁরা গিয়ে উপস্থিত হলেন এমন এক জায়গায় যেখানে পৃথিবীর অভিকর্ষের টান শেষ হয়েছে এবং চাঁদের অভিকর্ষের টান শুরু হয়েছে। তখন অ্যাপোলোর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২,২৩৩ মাইল আর চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে তার দূরত্ব ছিল প্রায় ৩০ হাজার মাইল।

এই স্থানটি অতিক্রম ক'রে যাওয়া মাত্রই চাঁদ যেন মহাকাশযানটিকে লুফে নিল। তখন থেকে চাঁদের আকর্ষণে প্রতিমুহূর্তেই অ্যাপোলোর গতিবেগ আবার বাড়তে লাগলো।

এরপর ভারতীয় সময় মঙ্গলবার বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে পৃথিবী থেকে নির্দেশ গেল,—"চন্দ্র প্রদক্ষিণের জন্য প্রস্তুত হও।"

সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ থেকে জবাব এল,—"প্রস্তুত আছি।"

চাঁদের অভিকর্ষের টানে মহাকাশযানটি ধনুকের মতো বাঁকা একটি পথে এগিয়ে গেল চাঁদের সেইদিকে, যেদিক মানুষ এর আগে আর কোনদিন দেখতে পায়নি। ৩টা ১৮ মিনিটে তাঁরা চাঁদের সেই অজ্ঞাত এবং অদৃষ্ট আকাশে গিয়ে হাজির হলেন। তখন তাঁদের সামনে অচেনা চাঁদ, আর পেছনে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বিস্তার। পৃথিবীর চিরচেনা মুখখানাও আর দেখা যাচ্ছে না। পৃথিবীর সঙ্গে বেতার সংযোগও সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন। কারণ, তাঁদের সম্মুখে তখন চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে এক অনতিক্রম্য বাধার মতো।

এই অবস্থায় মহাকাশচারীরা একটি বিপরীতমুখী রকেট চালিয়ে মহাকাশযানের গতিবেগ কমিয়ে ঘণ্টায় ৩,৭০০ মাইলের মধ্যে নিয়ে

এলেন। এই গতিবেগই মহাকাশযানকে চন্দ্রের কক্ষপথে স্থাপন ক'রল। শুরু হ'ল চন্দ্র প্রদক্ষিণ।

এদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে দু'হাজারেরও বেশী বিজ্ঞানী দুরু দুরু বক্ষে শ্বাস রোধ ক'রে প্রতি মুহূর্ত গুণছেন। হয় মহাকাশচারীরা পাবেন অনন্ত গৌরব, নয় তাঁরা চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবেন মহাকাশের অসীম অন্ধকারে।

ধীরে ধীরে কেটে গেল দুঃসহ ৩৭ মিনিট। তারপর ঠিক ৩টা ৫৫ মিনিটে বেতার-গ্রাহকে আবার ওদের গলা শোনা গেল। চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে করতে তাঁরা আবার চাঁদের এপিঠে চলে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কেপ্ কেনেডিতে উল্লাসের ঝড় বয়ে গেল। পৃথিবীর অগণিত মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো।

বেতার-তরঙ্গে খবর এল,—"বেশ আছি, চমৎকার আছি। ৪ মিনিটের একটু বেশী সময় রকেট-ইঞ্জিন চালু রাখতে হয়েছিল। চাঁদের সব-চাইতে কাছে যখন যাচ্ছি, তখন দূরত্ব থাকছে ৬০·৫ মাইল আর সব-চাইতে দূরে যখন যাচ্ছি, তখন ১৬৯ মাইল।"

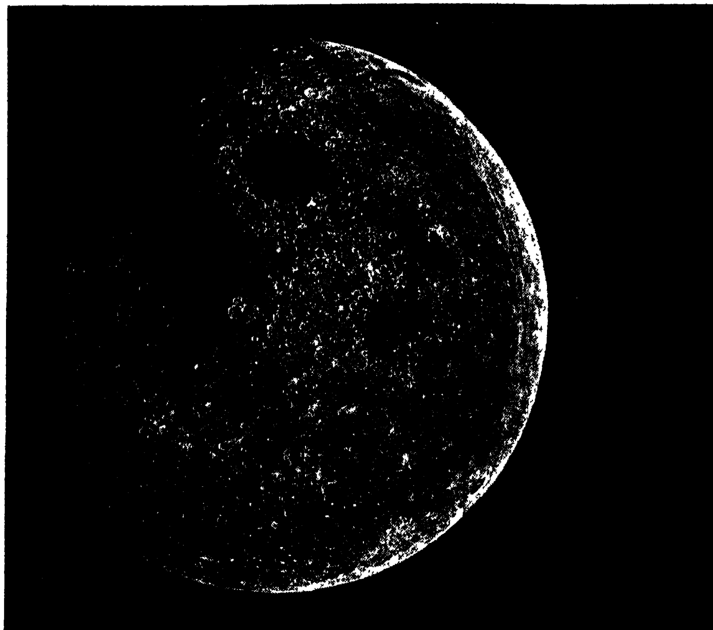
এরপর আরও ১১ সেকেণ্ড ধরে রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে ওঁরা মহাকাশযানের কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার ক'রে নিলেন। তখন দূরত্ব দাঁড়ালো প্রায় ৭০ মাইল।

চন্দ্র প্রদক্ষিণকালে টেলিভিশনে ওঁরা পৃথিবীতে চাঁদের ছবি পাঠালেন। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে চাঁদকে দেখলেন এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত পাঁচটি স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করলেন।

এতকাল মানুষ চাঁদকে দেখেছে প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূর থেকে, আর এখন লোভেল তাকে দেখলেন মাত্র ৭০ মাইল দূর থেকে।

পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র থেকে প্রশ্ন করা হ'ল,—"আবহমানকালের চাঁদকে কেমন দেখছ?"

লোভেল জবাব দিলেন,—"চাঁদটা আসলে ধূসর, আর কোন রং নেই। উর্বরতার সাগরকে পৃথিবী থেকে একরকম দেখায়, এখন দেখছি অন্য রকম। চন্দ্রপৃষ্ঠে আলো-আঁধারের যে সীমারেখা, তার দিকে যতই এগোচ্ছি বৈষম্যটা তত ফুটে উঠছে।"



চিত্র ৩৮। অ্যাপোলো-৮-এর জানালা থেকে গৃহীত আলোকচিত্র। চাঁদের অগোচর দিকের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। উপর দিকের গোলকার কালো ছোপটি হ'ল সংকটের সাগর। আর ডান পাশে নীচের দিকে কিনারার কাছে যে গিরিকেন্দ্রিক গহ্বরটি দেখা যাচ্ছে, তার নাম ত্সিওলকভ্স্কি।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

আর অধিনায়ক বোরম্যান বললেন,—"কঠিন পাথরে তৈরি এখানকার দিগন্তরেখা। আকাশ পিচের মতো ঘন অন্ধকারে মোড়া। আর সূর্য? সে যেন ধবধবে সাদা একটি আলোর পিণ্ড।

পায়ের নীচে ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে ক্যাস্‌পার ও গিল্‌বার্ট জ্বালামুখ দু'টি। আর দূরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটি পর্বতমালা, মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই পাহাড়ের চূড়া ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের গায়ে থাবা মেরে মেরে পাথরের চাঁই সরিয়ে কারা যেন বড় বড় গর্ত তৈরি ক'রে রেখেছে। ওরাই হ'ল সেইসব জ্বালামুখ যাদের আমরা এতকাল দূরবীণ দিয়ে দেখেছি। আজ এই মুহূর্তে তারা সকলেই আমাদের চোখের সামনে।"

চাঁদের জমির দিকে তাকিয়ে বোরম্যান আরও বলেছেন,—"এই বিশাল প্রাণহীন শূন্যতার ক্ষেত্র যেন আগন্তুকদের নামতে বারণ করছে। বাস করবার, কিংবা কাজ করবার পক্ষে এ জায়গাটা যে মনোহর নয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

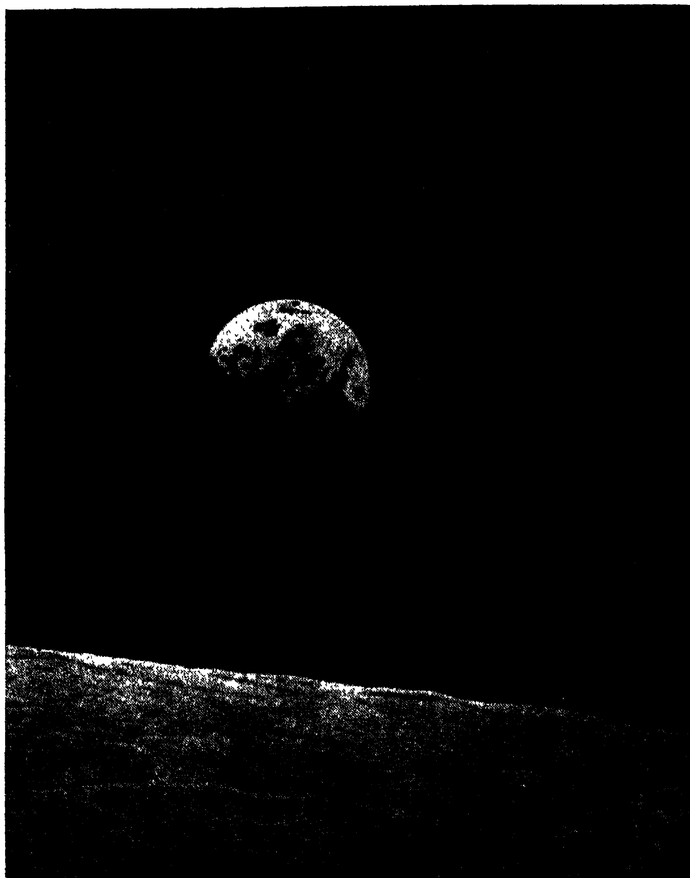
মহাকাশচারীরা চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন মোট দশবার, প্রত্যেকবার সময় লাগে প্রায় ২ ঘণ্টা ক'রে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকবারই প্রায় ৪৫ মিনিট সময় তাঁরা থাকেন চাঁদের আড়ালে, আর সেই সময় তাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ থাকেনি।

চাঁদের আকাশে গিয়ে ওঁরা পৃথিবীকেও দেখলেন, কিন্তু এবারে দেখলেন প্রায় ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মাইল দূর থেকে। সে এক নূতন চোখে দেখা। চাঁদকে আকাশে যেমন দেখা যায়, চাঁদের দেশে গিয়ে পৃথিবীকে দেখালো তার চেয়ে আরো অনেক বড় এবং সুন্দর। কারণ, পৃথিবীর ব্যাস চাঁদের ব্যাসের প্রায় চার গুণ। পৃথিবীর অর্ধেকটা সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, বাকি অর্ধেক রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা। আলোকিত অংশে উজ্জ্বল সাদা মেঘ, বাদামী রঙের জমি, আর নীল সমুদ্র সব স্পষ্ট দেখা গেল।

অ্যাপোলো-৮-এর জানালা থেকে ওঁরা ছবি তুললেন। নীচে চাঁদের জমি, আর দূরে আকাশে পৃথিবী। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

অভিযান শেষ, এখন ঘরে ফেরার পালা। চন্দ্রকে দশবার

প্রদক্ষিণ করার পর মহাকাশচারীরা চন্দ্রের অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট-ইঞ্জিনটি আবার চালু করে দিলেন। তখন মহাকাশযানটি ঘণ্টায় ৫,৫০০ মাইল বেগে ছুটলো পৃথিবীর



চিত্র ৩৯

অ্যাপোলো-৮-এর জানালা থেকে তোলা আলোকচিত্র।
নীচে চাঁদের জমি, আর দূরে আকাশে পৃথিবী। কী অপূর্ব দৃশ্য!
[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

দিকে। তখন কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে মহাকাশচারীদের কোন যোগাযোগ ছিল না, কারণ তখন মহাকাশযানটি ছিল চাঁদের ওপাশে। বলা বাহুল্য, চাঁদের অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করার পর্যায়টিও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইঞ্জিনটি ঠিকমতো চালু না হ'লে, কিংবা তাতে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে, মহাকাশচারীদের জীবনে ঘনিয়ে আসতো এক দারুণ দুর্বিপাক।

যাই হোক, ওঁরা নির্ভুল পথে এগিয়ে এসে এক সময় পৃথিবীর অভিকর্ষের এলাকায় প্রবেশ করলেন। তখন থেকে মহাকাশ-যানের গতিবেগ ক্রমশ বাড়তে লাগলো। অ্যাপোলো-৮ যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমায় এসে পৌঁছালো, তখন তার গতিবেগ দাঁড়িয়েছে ২৪,৬৩০ মাইল। এই প্রচণ্ড গতিবেগ থাকায়, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার সময়, অ্যাপোলো-৮-কে এমন-ভাবে পরিচালিত করা হ'ল যাতে তাপ-প্রতিরোধক আবরণসহ মহাকাশযানের চেপ্টা দিকটা থাকে পৃথিবীর দিকে। কী অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কুশলতা! বাইরের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ৩,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে, কিন্তু তখন কেবিনের ভিতরে উষ্ণতা রইল মাত্র ২১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। মহাকাশচারীরা সবচেয়ে দ্রুতবেগে বায়ু-মণ্ডলে প্রবেশ করার এবং সবচেয়ে বেশী উষ্ণতা সহ্য ক'রে বেঁচে থাকার এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন।

এরপর তাঁদের ক্যাপসুলটি প্যারাসুটে ভর ক'রে সুনির্দিষ্ট সময়ে (শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ২০ মিনিটে), এবং হাওয়াই দ্বীপের কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরের এক সুনির্দিষ্ট জায়গায়, নির্বিঘ্নে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটি হেলিকপ্টার গিয়ে মহাকাশ-চারীদের তুলে নিয়ে এল কাছাকাছি অপেক্ষমান ইয়র্কটাউন জাহাজে।

মহাকাশচারীরা সব সমেত ছ'দিন তিন ঘণ্টা সময় পৃথিবীর বাইরে ছিলেন। তাঁরা চাঁদের দিকে ভ্রমণ করেন ৬৯ ঘণ্টা, চন্দ্র

প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ২০ ঘণ্টা, আর পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে সময় লাগে ৫৮ ঘণ্টা। এই ১৪৭ ঘণ্টা সময়ে তাঁরা অতিক্রম করেছেন মোট ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার মাইল পথ। এতকাল এ ছিল মানুষের কল্পনারও বাইরে।

বোরম্যান, লোভেল এবং অ্যাণ্ডার্স, এঁরা হলেন এ যুগের তিন শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী। এঁরাই প্রথম মানবদল যাঁরা পৃথিবীর অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন ক'রে চলে গেছেন অন্য এক জ্যোতিষ্কের আকাশে। সেই জ্যোতিষ্কের অভিকর্ষকে জড়িয়ে ধরে তাকে বার বার প্রদক্ষিণ করেছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠের দূর-বিস্তৃত প্রান্তর, সুউচ্চ পর্ব্বতমালা, আগ্নেয়-গিরির গহ্বর, শব্দহীন চিরস্থির মহামরুর বীভৎসতা সবই তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন নিকট থেকে, বিজ্ঞানীর সন্ধানী দৃষ্টিতে। চাঁদের অগোচর দিক, অর্থাৎ যে দিকটি মানুষ এর আগে কোনদিন দেখতে পায়নি, সেদিকও তাঁরা দেখেছেন। আর দেখেছেন, তাঁদের চিরচেনা পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে। তারপর একসময়, দুরন্ত দামাল ছেলেদের মতো, শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছেন জননী পৃথিবীর কোলে। তাই তো দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা মহাকাশের বীর কলম্বসদের জানিয়েছেন আন্তরিক অভিনন্দন। এঁদের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে চিরকাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

চাঁদের ভেলা :

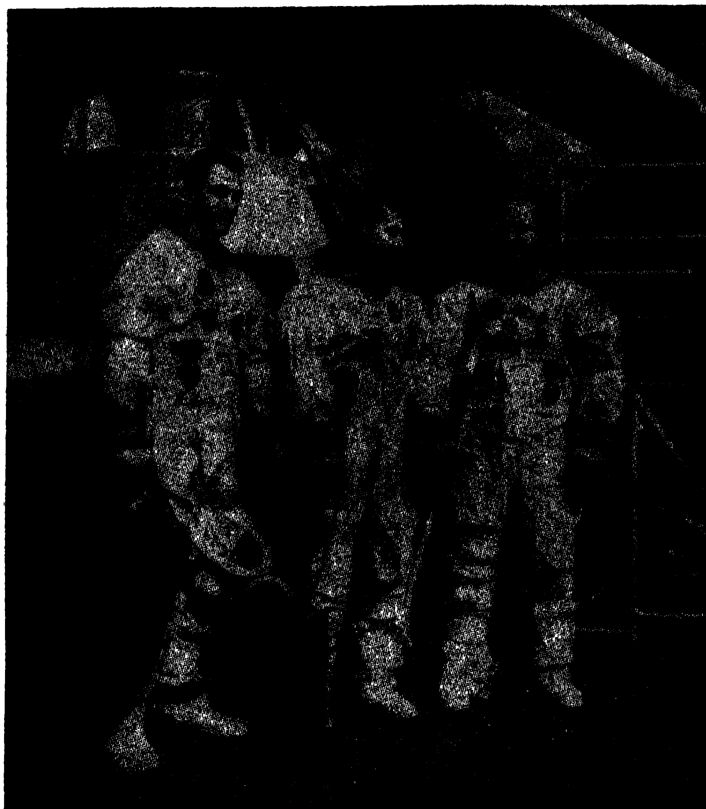
দেখি নাই কভু, শুনি নাই কানে—এমন তরণী বাওয়া! এযুগের আর এক দুঃসাহসিক অভিযানের খবর, পৃথিবীর দু'টি মানুষ 'চাঁদের ভেলা'-তে ক'রে ভেসে পড়েছেন মহাসমুদ্রে, মহাসমুদ্রে মানে মহাকাশে, দু'-দু'বার চাঁদের দশ মাইলের মধ্যে গিয়ে তাকে ভাল ক'রে দেখেছেন, তারপর নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন মূল মহাকাশ-যানে, সেখান থেকে আবার জননী পৃথিবীর কোলে।

দুঃসাহসিক মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে এ এক নূতন বিস্ময়। অ্যাপোলো-১০ এইভাবে নূতন সাফল্যের গৌরবে দীপ্ত হয়ে মানুষের মনের মহাকাশকেও দীপ্ত ক'রে তুলেছে। টমাস্ পি. স্ট্যাফোর্ড, ইউজিন এ. সারনান এবং জন ডব্লিউ. ইয়ং—এই তিনজন মার্কিন মহাকাশচারী যাঁরা মানবীয় প্রতিভা, কৌতূহল ও দুঃসাহসিকতার প্রতিনিধি হয়ে এই ঘটনার নায়কতা করেছেন, তাঁরা যে সমগ্র বিশ্ববাসীর হর্ষোৎফুল্ল বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার দ্বারা অভিনন্দিত হবেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৬৯ সালের ১৮ই মে, রবিবার বেলা ১২টা ৪৯ মিনিট (ভারতীয় সময় রাত্রি ১০-১৯ মি.) ফ্লোরিডার উপকূলবর্তী কেপ্ কেনেডিতে ৩৬৪ ফুট উঁচু স্যাটার্ন-৫ রকেটের ইঞ্জিনগুলি ঘোররবে গর্জন করে উঠলো। তিনজন মানব-আরোহী নিয়ে ৩,০০০ টনেরও বেশী ওজনের রকেটটি ধীরে ধীরে তার অবস্থান স্থল ছেড়ে উঠলো। তার দেহের চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা বিরাট এক অগ্নিশিখার বিপুল ধাক্কায় সে মেঘ ফুঁড়ে আকাশে উঠলো, তারপর দক্ষিণ দিকে মুখ ঘুরিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই চলে গেল দৃষ্টির অন্তরালে। জ্বালানি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের রকেটটি খসে পড়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটটিও এমনি ক'রে খসে পড়ে গেল। এর পর তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটিকে খানিকক্ষণ জ্বালিয়ে অ্যাপোলো-১০-কে পৃথিবীর উপরের কক্ষপথে স্থাপন করা হ'ল। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হ'ল ১০১ থেকে ১০২'৬ মাইলের মধ্যে। সব সমেত সময় লাগলো মাত্র ১১ মিনিট।

এর পরের খবর—মহাকাশচারীরা পূর্ব পরিকল্পনা মতো ভারতীয় সময় রাত্রি ১টা ৫৩ মিনিটে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট চালু ক'রে চাঁদের দিকে তাঁদের পথ সুনির্দিষ্ট ক'রে নিয়েছেন। তৃতীয় পর্যায়ের রকেটের কাজ শেষ, তাই সেটা আপনা থেকে খসে পড়ে গেল। অ্যাপোলো-১০ ঘণ্টায় ২৪,১৯৬ মাইল বেগে ছুটে চললো চাঁদের

দিকে। মহাকাশচারীদের সামনে তখন রূপালি চাঁদ, আর নীচে সুন্দর পৃথিবী।



চিত্র ৪০

অ্যাপোলো-১০-এর অভিযাত্রিগণ। (বাঁদিক থেকে) ইউজিন এ. সারনান, জন ডব্লিউ. ইয়ং এবং টমাস পি. স্ট্যাফোর্ড।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

চাঁদে যাবার পথে, প্রায় ২০ হাজার মাইল দূর থেকে পৃথিবীকে যেমনটি দেখা গেল, তারই রঙিন ছবি মহাকাশচারীরা পাঠালেন।

পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে টেলিভিশনে দেখলো পৃথিবীর রঙিন ছবি—নীল সমুদ্র, ধূসর মাটি, দূর-বিস্তৃত পর্বতমালা, সুবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর······আকাশে ভেসে-চলা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ······অন্তহীন শূন্যতার পটভূমিকায় পৃথিবী······অবর্ণনীয় কৃষ্ণতার মধ্যে ভেসে থাকা পৃথিবী! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরোপ পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র মেঘের আবরণে ঢাকা···সুমেরু ও কুমেরু শ্বেত মুকুট ধারণ ক'রে প্রতীক্ষা করছে।

রঙিন টেলিভিশনে আরও একটি ছবি দেখা গেল—রকি পর্বত-মালার ওধারে দিনের শেষে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। চলতি পথে মহাকাশযানের একপাশে সূর্যরশ্মি বর্ষিত হবে অবিরল ধারায়, তাই সে দিকটা ভয়ংকর উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, আবার যে দিকটা থাকবে ছায়ার মধ্যে, সে দিকটা ভয়ংকর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এই বিপর্যয় এড়াবার জন্যে এমন ব্যবস্থা করা হ'ল, যাতে অ্যাপোলো-১০ তার যাত্রাপথে ঘণ্টায় প্রায় তু-বার ক'রে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে। এর ফলে তাপটা সমানভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

মহাকাশযান নির্ভুল পথে চাঁদের দিকে এগিয়ে চললো। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে চলতে চলতে তার গতিবেগ ক্রমশ কমতে লাগলো, যেমন চড়াই পথে উঠবার সময় গাড়ির গতিবেগ ক্রমশ কমে যায়। তারপর এক সময় তা গিয়ে হাজির হ'ল সেই জায়গায় যেখানে পৃথিবী এবং চাঁদের আকর্ষণ সমান হয়ে গেছে। এর পর থেকে চাঁদের অভিকর্ষের টানে মহাকাশযানের গতিবেগ আবার ক্রমশ বাড়তে লাগলো।

এইভাবে চলতে চলতে ধনুকের মতো বাঁকা একটি পথে ঘুরে গিয়ে অ্যাপোলো-১০ যখন চাঁদের উল্টো পিঠে গিয়ে হাজির হ'ল, তখন তার গতিবেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ৫,৭০০ মাইল। বুধবার ভারতীয় সময় রাত্রি ২টা ১৫ মিনিটে উল্টো দিকে রকেট চালিয়ে অ্যাপোলোর

গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হ'ল, শুরু হ'ল চন্দ্র প্রদক্ষিণ। চাঁদের উপরের এই কক্ষপথ হ'ল উপবৃত্তাকার, চাঁদ থেকে দূরত্ব ৭০ মাইল থেকে ১৯৬ মাইল পর্যন্ত। আরও দু'বার রকেট জ্বালিয়ে কক্ষপথ বৃত্তাকার করে নেওয়া হ'ল। তখন এই দূরত্ব হ'ল প্রায় ৭০ মাইল।

কিন্তু বুধবার শেষ রাত্রেই একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। অ্যাপোলো-১০-এর 'কম্যাণ্ড মডুল' বা মূল মহাকাশযান থেকে 'লূনার মডুল' বা চাঁদের ভেলাকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে দেখা গেল, সংযোগ রক্ষাকারী সুড়ঙ্গ থেকে অক্সিজেন বের ক'রে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ, তা না ক'রে বিচ্ছিন্ন হ'তে গেলে চন্দ্রযানটি ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকবে। সে অবস্থায় ধ্বংস অনিবার্য। সমগ্র পরিকল্পনাটিই বানচাল হয়ে যাবার উপক্রম। এখন উপায় ?

এই গুরুতর সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল হিউসটনে, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে। সেখানকার কর্মীরা তক্ষুণি হাজির হলেন কম্‌পিউটারের সামনে—এই সমস্যার সমাধান কী, তা জানতে চাইলেন যান্ত্রিক মস্তিষ্কের কাছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সঠিক জবাবটি চলে গেল চাঁদের আকাশে মহাকাশচারীদের কাছে। আর সেই নির্দেশ মতো যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক ক'রে নিতে পুরো পনরো মিনিট সময়ও লাগলো না। কী অদ্ভুত কারিগরি কুশলতা !

বৃহস্পতিবার রাত্রে, চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে করতে দশম বারের বার, প্রথমে সারনান এবং তারপরে স্ট্যাফোর্ড প্রায় তিন ফুট লম্বা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে 'চাঁদের ভেলা'-র মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর, ওঁরা যখন চাঁদের ওপিঠে, পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার নাগালের বাইরে, তখন চাঁদের ভেলাটি মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ইয়ং রইলেন মূল মহাকাশযানে, সদা সতর্ক প্রহরীর মতো, হঠাৎ প্রয়োজন হ'লে মহাকাশচারীদের উদ্ধার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে।

ঘুরতে ঘুরতে ওঁরা যখন আবার চাঁদের এপিঠে চলে এলেন, তখন

সারনান বেতারে খবর পাঠালেন,—“আমরা এখন পরস্পর থেকে ৩০-৪০ ফুট দূরে রয়েছি।”

প্রায় ৪০ মিনিট রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষার পর তাঁদের পৃথক্ অবস্থানের কথা জানতে পেরে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে উল্লাসের ঝড় বয়ে গেল।

এদিকে মাকড়সার মতো দেখতে অত্যন্ত দুর্বল এবং পল্‌কা এই চাঁদের ভেলায় ক’রে তাঁরা তখন মহাকাশে ভেসে চলেছেন। দেখতে দেখতে তাঁরা নেমে গেলেন চাঁদের দশ মাইলের মধ্যে, চাঁদকে আরও ভাল করে দেখবেন ব’লে। চাঁদের মৃত আগ্নেয়গিরিগুলির ভিতরে বড় বড় পাথরের চাঁই দেখে তাঁরা তো বিস্ময়ে হতবাক। চাঁদের দিগন্তে পৃথিবীর উদয় দেখে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা।

এক সময় সারনান চীৎকার ক’রে উঠলেন,—“আমরা ঠিক সেখানে, আমরা ঠিক তার উপরে। আমরা তার উপরে এসে পড়েছি। ঐ যে মাস্‌কেলীন, একেবারে আমাদের সামনে।”

মাস্‌কেলীন একটি বড় জ্বালামুখ। জুলাই মাসে (১৯৬৯) দু’জন মার্কিন মহাকাশচারী চাঁদের শান্ত-সাগরের (sea of tranquility) যেখানে অবতরণ করবেন ব’লে স্থির করেছেন, তারই কাছে এটি অবস্থিত।

স্ট্যাফোর্ড বললেন,—“এর মধ্যে আর আশে-পাশে চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে বড় বড় পাথরের চাঁই।”

তবে মহাকাশচারীরা জানালেন যে, অবতরণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত জায়গাটি বেশ সমতল। কিন্তু আরও পূর্বদিকে অবস্থিত আর একটি নির্বাচিত জায়গায় দেখা গেল, অসংখ্য পাথরের চাঁই ইতস্ততঃ পড়ে আছে।

তাই দেখে স্ট্যাফোর্ড বললেন,—“ওই পাথরের চাঁইগুলো তুলে নিয়ে আমাদের দেশের (টেক্‌সাসের) গাল্‌ভেস্‌টন উপসাগরটি ভরে ফেলতে পারি।”

অবশ্য দ্বিতীয়বার এই জায়গাটির উপর দিয়ে ভেসে যাবার সময়

স্ট্যাফোর্ড বলেছেন,—"না, শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ জায়গা খালি পড়ে আছে।"

মহাকাশচারীরা আরও জানালেন যে, সাধারণভাবে ধূসর আর বাদামী এই দু'রকম রং তাঁরা দেখেছেন। জ্বালামুখের কিনারা ধবধবে সাদা, আর তলাটা কালো, আর পাথরের চাঁই এক একটি খুব বড়, ব্যাস অন্ততঃ ১০০ ফুট।

"সাইড উইণ্ডার রিল্" নামক চাঁদের একটি "ক্যানিয়ন" (দীর্ঘ এবং সরু পার্বত্য খাদ) সম্পর্কে স্ট্যাফোর্ড বললেন,—"এর তলদেশ চেপ্টা এবং সমতল। আর দু'ধার গোল হয়ে উপর দিকে উঠে এসেছে।"

সারনান বললেন,—"সবচেয়ে ভাল বর্ণনা যা দিতে পারি তা হ'ল এই যে, এ হ'ল একটি শুকনো নদী, হুবহু মেক্সিকো বা অ্যারিজোনার একটি শুকনো নদীর মতো।"

দ্বিতীয়বার পরিক্রমা শেষে চাঁদের ভেলার আরোহণ অংশটি (Ascent stage) অবতরণ অংশ (Descent stage) থেকে পৃথক্ ক'রে নেওয়া হ'ল। কারণ ভবিষ্যতে মহাকাশচারীরা এই অংশে চড়েই চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মূল মহাকাশযানে উঠে আসবেন। অবতরণ অংশটি চন্দ্রপৃষ্ঠেই পড়ে থাকবে এবং রকেট উৎক্ষেপণের প্ল্যাটফরমস্বরূপে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এই সময় সামান্য একটু ভুলের জন্য দেখা দিল দারুণ এক দুর্বিপাক। হঠাৎ চাঁদের ভেলাটি প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে শুরু ক'রল।

সারনান আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠলেন,—"এই, এটা নিশ্চয়ই চাঁদের মাটিতে ভেঙে পড়বে।" ঘাবড়ে গিয়ে গালাগালি শুরু ক'রে দিলেন।

স্ট্যাফোর্ড পাশেই বসে ছিলেন, তিনি কিন্তু নির্বিকার। ধীরে সুস্থে এগিয়ে গিয়ে সুইচ বোরডের হাজার বোতামের মধ্যে একটি টিপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভেলাটি স্থির হয়ে গেল।

চাঁদের ভেলা মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় আট ঘণ্টা ধ'রে মহাকাশে ভেসে বেড়ালো, মানুষের চন্দ্রে পদার্পণের পথ সুগম করে দিল। এবারে আরোহণের রকেট চালু ক'রে উপরের কক্ষপথে উঠে আসতে হবে। সেখানে গিয়ে মূল মহাকাশযানের সঙ্গে মিলতে হবে, নতুবা মহাকাশেই হবে তাঁদের অনন্ত নির্বাসন। আর এজন্য তাঁদের ঠিক ২৬ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি ক'রে উঠে যেতে হবে, এক ডিগ্রী এদিক-ওদিক হ'লেও চলবে না।

স্ট্যাফোর্ড বোতাম টিপলেন এবং দেখতে দেখতে নির্ভুল গতিতে তাঁরা উঠে এলেন উপরের কক্ষপথে। তারপর চাঁদের ভেলা আবার মূল মহাকাশযানের সঙ্গে মিলিত হ'ল। দু'টিতে জোট বেঁধে আবার চন্দ্র প্রদক্ষিণ শুরু ক'রল।

কিন্তু এই মিলন ঘটলো চাঁদের ওপিঠে বেতার সংশ্রব বর্জিত আকাশে। কাজেই দু'টিতে জোট বেঁধে যখন এপিঠে চলে এল, তখনই শুধু পৃথিবীর মানুষ এই সুসংবাদ জানতে পারলো। এতক্ষণে সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো। এদিকে ভেলাটি অ্যাপোলোর দেহে তার মাথাটি ঢুকিয়ে দিতেই তাঁরা দু'জন ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে 'কম্যাণ্ড মডুল'-এ, অর্থাৎ মূল মহাকাশযানে, চলে এলেন—প্রথমে স্ট্যাফোর্ড তারপর সারনান। ইয়ং বললেন,—"যন্ত্রটি সত্যিই চমৎকার!"

চাঁদের ভেলা তার কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছে। একে আর 'কম্যাণ্ড মডুল'-এর মাথায় ক'রে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। অতএব, নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী, ভেলাটিকে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল মহাসমুদ্রে, অর্থাৎ তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল মহাকাশের অসীম শূন্যতার মাঝে, অনন্তকালের নির্বাসনে। নতুবা ভবিষ্যতে মানুষের চাঁদে যাওয়া-আসার পথে সে এক অবাঞ্ছিত উপদ্রব হয়ে থাকতো।

অ্যাপোলো-১০-এ চড়ে তাঁরা ক্রমাগত চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে

চলেছেন। উদ্দেশ্য, চাঁদকে আরও ভাল ক'রে দেখা, আরও অনেক ছবি নেওয়া।

এক সময় মহাকাশচারীরা খবর পাঠালেন,—"আমরা সুখী, কিন্তু তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত।"

একটু পরেই তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। আগের দিন খুব খাটুনি গিয়েছে। আশা করা গিয়েছিল যে, তাঁরা বেশ খানিকটা ঘুমোবেন। কিন্তু সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে ওঁরা অনেক আগেই উঠে পড়লেন, এবং খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেন। ভারতীয় সময় রাত্রি সাড়ে বারটায় খবর এল, তাঁরা ভাল আছেন। ২১ তম আবর্তনে তাঁরা এখন চাঁদের ছবি তুলতে ব্যস্ত।

অভিযান শেষ, এখন ঘরে ফেরার পালা। ক্রমাগত আড়াই দিন ধরে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করবার পর ৩১ তম আবর্তনে ২ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ড রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে আপোলোর গতিবেগ ঘণ্টায় ৩,৬৮০ থেকে ৬,১৩৫ মাইলে তোলা হ'ল। এর ফলে পৃথিবীতে ফেরবার পথে যাত্রা শুরু হ'ল।

এর পরের সংবাদ—নির্ভুল পথে এগিয়ে এসে তাঁরা এক সময় পৃথিবীর অভিকর্ষের এলাকায় প্রবেশ করলেন। তখন থেকে মহাকাশযানের গতিবেগ ক্রমশ বাড়তে লাগলো। অ্যাপোলে-১০ যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সীমায় এসে পৌঁছুলো, তখন তার গতিবেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ২৪,৭৬০ মাইল। এই প্রচণ্ড গতিবেগ থাকায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার সময় অ্যাপোলো-১০-কে এমনভাবে পরিচালিত করা হ'ল, যাতে প্লাস্টিক জাতীয় তাপ-প্রতিরোধক আবরণসহ ক্যাপস্যুলের চ্যাপ্টা দিকটা থাকে পৃথিবীর দিকে। বাইরের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ৩,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, কিন্তু তখন কেবিনের ভিতরে তাপমাত্রা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রইলো। কী অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কুশলতা!

এর পরে মাত্র পনরো মিনিটের মধ্যেই ক্যাপ্‌স্যুলটি বিরাট

বিরাট তিনটি প্যারাসুটে ভর ক'রে ধীরে ধীরে (ঘণ্টায় প্রায় ২২ মাইল বেগে) পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়ে (সোমবার ভারতীয় সময় রাত্রি ১০ টা ২২ মিনিটে) সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরের এক সুনির্দিষ্ট জায়গায় নির্বিঘ্নে নেমে এলো। সমুদ্র তখন শান্ত ছিল, আর আকাশে ছিল ভোরের আলো।

এর প্রায় তিন মাইলের মধ্যেই উদ্ধারকারী জাহাজ প্রিন্সটন অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে একটি হেলিকপ্টার ছুটে গেল ক্যাপ্সুলটির কাছে। সেখান থেকে বেতারে জানানো হ'ল—Welcome back to earth.

ক্যাপ্সুলের ভিতর থেকে মহাকাশচারীর শান্ত স্বর ভেসে এলো,—Okay rescue, take your time and take it easy.... we're right here and we want you to be good.

এরপর ক্যাপ্সুলের ঢাকনা খুলে মহাকাশচারীরা বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারে ক'রে তাঁদের নিয়ে আসা হ'ল নিকটে অপেক্ষমান প্রিন্সটন জাহাজে। ভারতীয় সময় তখন রাত্রি এগারোটা।

এইভাবে ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এবং দুঃসাহসী অভিযানের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল। এর ফলে মানুষ চাঁদের দশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল। চন্দ্রে অবতরণের সব রকম মহড়া সম্পূর্ণ সফল হ'ল। অভিযাত্রীরা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং দুঃসাহসিকতার অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। নিশ্চিত বোঝা গেল, মানুষের এতকালের স্বপ্ন এখন সফল হবার পথে, অর্থাৎ মানুষের চন্দ্রে অবতরণের পথে এখন আর কোনও বাধা নেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চাঁদে নামার মহড়া

এইভাবে চন্দ্রের অভিযান সম্পর্কে প্রতিটি পর্যায়ের খুঁটিনাটি সব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষ হ'ল, বাকি রইল শুধু চাঁদে নামা।

এই দুঃসাহসিক অভিযানের অভিযাত্রীরূপে নির্বাচিত হলেন তিনজন মার্কিন মহাকাশচারী—নীল এ. আর্মস্ট্রং (অধিনায়ক), এডুইন ই. আল্‌ড্রিন এবং মাইকেল কলিন্‌স। যাত্রার দিনক্ষণও ঘোষিত হ'ল। তারপর শুরু হ'ল প্রস্তুতি পর্ব। মহাকাশচারীরা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চাঁদে নামার মহড়া দিতে লাগলেন।

এই পৃথিবীতে চাঁদের মতো পরিবেশ কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্তু মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। মার্কিন বিজ্ঞানীরা চাঁদের ভৌত পরিবেশের অনুকরণে টেক্‌সাসের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে উপল-বন্ধুর এক সমতলভূমি গড়ে তুললেন। গত ৩।৪ বছরে রেঞ্জার, সার্ভেয়ার এবং অর্বিটার পর্যায়ের চন্দ্রযানগুলি চাঁদের প্রায় প্রতি ইঞ্চি জমিরই আলোকচিত্র পাঠিয়েছে। এর ফলে চাঁদের দৃশ্য এখন বিজ্ঞানীদের কাছে ভূ-দৃশ্যের মতোই পরিচিত। কাজেই নকল চন্দ্র-নিসর্গ তৈরি করতে তাদের কোনরূপ বেগ পেতে হয়নি। মহাকাশ-চারীদের বিশ্বাস, চাঁদের এই দৃশ্য এমন বাস্তব যে তাঁরা যখন সত্যি সত্যি চাঁদে নামবেন তখন চন্দ্র-পৃষ্ঠ তাঁদের বাড়ির উঠোনের মতোই পরিচিত ব'লে মনে হবে।

কিন্তু চাঁদে নামার মহড়ায় আর একটা বড় সমস্যা হ'ল কৃত্রিম উপায়ে চাঁদের মহাকর্ষ সৃষ্টি করা। আমরা জানি, চাঁদের মহাকর্ষ পৃথিবীর $\frac{1}{6}$ ভাগ মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর বুকে এরূপ পরিবেশ পাওয়া যাবে কোথায়?

ইঞ্জিনিয়াররা এ সমস্যারও সমাধান করে ফেললেন। তাঁরা

এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, যার একটি তার থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় একটি ঢালু বোর্ডের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময়, মহাকাশ-চারীর দেহের ভার ⅙ ভাগ বলে মনে হয়। এমনি আর একটি যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশচারী শূন্যে তারের উপর দিয়ে হেঁটে যান, ঠিক যেমন ক'রে একজন অভিনেতা স্টেজের উপরে উড়ে যায়। এতেও কৃত্রিম ভাবে চাঁদের অভিকর্ষ সৃষ্টি হয়।

এসব সত্ত্বেও চাঁদের অভিকর্ষের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া মহাকাশচারীর পক্ষে এক কঠিন সমস্যা। চাঁদের অভিকর্ষ কম, তাই সেখানে গিয়ে একজন অভিযাত্রী অনায়াসে ২০-২১ ফুট উঁচুতে লাফিয়ে উঠতে পারবেন।



চিত্র ৪১। চাঁদে চলাফেরার উপযোগী মহাকাশ-পোশাক পরিহিত মহাকাশচারী।

কিন্তু তাঁকে মনে রাখতে হবে যে, তাঁর দেহের ভর (mass) সমানই থেকে যাচ্ছে, কাজেই চাঁদের কোনও পাথরের উপর সজোরে আছড়ে পড়লে আঘাত সমানই লাগবে, যেমন লাগে এই পৃথিবীতে। কাজেই উৎসাহের আতিশয্যে জোরসে লাফিয়ে উঠলে, পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙ্গা কিছুই বিচিত্র নয়। সুতরাং এসব কথা মনে রেখেই তাঁকে চলা-ফেরা প্র্যাক্‌টিস করতে হবে।

এখানে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। চাঁদে কোনও আবহমণ্ডল নেই, কাজেই সেখানে চলাফেরা করতে হলে প্রত্যেকটি অভিযাত্রীকেই বেঁচে থাকার উপযোগী কৃত্রিম আবহমণ্ডল সৃষ্টির যন্ত্রপাতি সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য তাকে পরতে হবে মহাকাশ-পোশাক। এ যেন ছোট-খাট একটা যন্ত্রাগার। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য এর ভিতর আবহমণ্ডল তৈরি হবে বিশুদ্ধ অক্সিজেন দিয়ে এবং এর মধ্যেকার চাপ হবে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩'৭ পাউণ্ড (বা, প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ২৬০ গ্রাম)। এই পোশাকের তাপ-প্রতিরোধক ব্যবস্থা এমন চমৎকার যে, চাঁদের উষ্ণতা দিনের বেলা ১১৯° সেন্টিগ্রেড (বা, ২৫০° ফারেনহাইট) থেকে রাত্রিবেলা –১৫৫° সেন্টিগ্রেড (বা, –২৫০° ফারেনহাইট) পর্যন্ত ওঠা-নামা করলেও, এর মধ্যে মহাকাশচারী সর্বদাই বাসগৃহের স্বাচ্ছন্দ্যে বিরাজ করবেন। এছাড়া মহাকাশচারীর পিঠে থাকবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাবার জন্য অক্সিজেন-ট্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ সরবরাহের যন্ত্রপাতি এবং সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্রপাতি (অর্থাৎ খুঁদে রেডিও রিসিভার এবং ট্র্যান্‌সমিটার)। ধরা যাক্, একজন অভিযাত্রীর ওজন ৭৫ কে. জি.। তাঁর মহাকাশ-পোশাকের ওজন হবে প্রায় ২৫ কে. জি. এবং পিঠের যন্ত্রপাতির ওজন হবে অন্ততঃ ৫০ কে. জি.। তাহলে সবশুদ্ধ ওজন দাঁড়াবে অন্ততঃ ১৫০ কে. জি.। তবে চাঁদে গিয়ে স্বাভাবিক কারণেই এই ওজন দাঁড়াবে মাত্র ২৫ কে. জি.।

এই কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরে চলতে গেলে হুমড়ি খেয়ে

পড়তে হবে। এজন্য মহাকাশ-পোশাক প'রে চাঁদের কৃত্রিম জমিতে হাঁটা-চলার প্র্যাক্‌টিস করাও হ'ল ট্রেনিংয়ের এক বিশেষ অঙ্গ। শুধু হাঁটা-চলা নয়, চাঁদের ভেলা থেকে একটা মই বেয়ে চাঁদের মাটিতে পা ফেলা, সেখানে গিয়ে ড্রিল দিয়ে পাথর-মাটি খোঁড়া, সেগুলি বায়ুশূন্য নিশ্ছিদ্র বাক্সে এবং প্লাস্টিক ব্যাগে পোরা এসব কাজেরও মহড়া দিতে হয়েছে বারবার, যাতে নতুন পরিবেশে তাড়াহুড়ার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে সবকিছু পণ্ড না হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হ'ল, কলিন্‌স থাকবেন মূল মহাকাশ-যানে আর আর্মস্ট্রং এবং আল্‌ড্রিন চাঁদের ভেলায় ক'রে নেমে যাবেন চাঁদের বুকে। কিন্তু চাঁদের ভেলা যখন মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে চাঁদে নামবে, সেই সময়টাই হবে ঐ দু'জন যাত্রীর পক্ষে সবচেয়ে সংকটের সময়। এসময় তাঁদের একদিকে যেমন দেখতে হবে চাঁদের ভেলা ঠিক পথে চলছে কিনা, যন্ত্রপাতি সব ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, অন্যদিকে তেমনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে দ্রুত এগিয়ে আসা চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে। অবশ্য এসব কাজের নির্ভুল নির্দেশ আসবে রাডার যন্ত্রের ভিতর দিয়ে। তবুও এক্ষেত্রে সামান্য ভুল-ত্রুটিরও অবকাশ নেই। তাহলে ধ্বংস অনিবার্য। এজন্য যাত্রীদের বারে বারে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের মহড়া দিতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর্মস্ট্রং বলেছেন,—"চালকের কাছে সবরকম খবর আসতে থাকে যন্ত্রের ভিতর দিয়ে, এবং সে একটা জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পায় দ্রুত এগিয়ে আসা চন্দ্রপৃষ্ঠের বিরাট ছবি, ঠিক সিনেরামার মতো। এই যন্ত্রের (সিমুলেটর) সাহায্যেই আমরা একটি মহড়া বারবার অভ্যাস করি, যতক্ষণ না তা একেবারে রুটিনে পরিণত হয়।

যদি আমরা ভুল করি, তাহলে শুধু পুনরাবৃত্তির বোতামটা (reset button) টিপে দেই, তাতে মহড়াটা আবার প্রথম থেকে শুরু হয়ে যায়। আমরা ঠাট্টা ক'রে বলি যে, আসল মহড়ার সময়

যদি বিপদে পড়ি, তাহ'লে আমরা হয়তো স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুনরাবৃত্তির বোতামটা খোঁজাখুজি ক'রব।"

কিন্তু সত্যকার অবতরণের সময় এমনি ক'রে বোতাম টিপে পুনরায় প্রথম থেকে মহড়া শুরু করা যাবে না। মহাকাশচারীকে প্রথম সুযোগেই নির্ভুলভাবে নেমে যেতে হবে চাঁদের মাটিতে। তাই এই অভিযানের অধিনায়ক আর্মস্ট্রংকে 'চাঁদের ভেলা' নিয়ে চাঁদে নামবার মহড়া দিতে হয়েছে বার বার। আগের বছর (১৯৬৮) মে মাসেই এরূপ এক মহড়ার সময় তিনি প্রায় মারা পড়েছিলেন। চন্দ্রে অবতরণ সম্পর্কে ট্রেনিং নেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত চন্দ্রযানে ক'রে তিনি যখন কয়েক শ' ফুট উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন, তখন চন্দ্রযানটি হঠাৎ বিগড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি বোতাম টিপে নিজেকে বার ক'রে আনলেন এবং প্যারাসুটে ভর ক'রে নিরাপদে নেমে এলেন। তার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চন্দ্রযানটি টেক্সাসের কৃত্রিম চন্দ্রভূমিতে আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কী অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আর কী অদ্ভুত ইস্পাত-কঠিন নার্ভ!

আর্মস্ট্রং মহাকাশ সংস্থায় যোগ দেন ১৯৬২ সালে। তার আগেই একজন প্রথম শ্রেণীর 'পাইলট' বা বৈমানিক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কয়েক বছর আগে, একটি X-15 বিমানে ক'রে ৬৪ কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত উড়ে তিনি রেকর্ড স্থাপন করেন। বৈমানিক হিসেবে ঘণ্টায় ৬,৩৮২ কিলোমিটার বেগে, অর্থাৎ শব্দের পাঁচগুণ বেগে, উড়ে গিয়ে অভাবনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

মহাকাশ সংস্থায় যোগ দেওয়ার পর, ১৯৬৬ সালে, তিনি জেমিনি-৮-এর অধিনায়ক হিসেবে ডেভিড স্কটকে সঙ্গে নিয়ে মহাকাশে যান এবং সর্বপ্রথম একটি মনুষ্যবিহীন মহাকাশযানের সঙ্গে তাঁর মহাকাশযানের ডকিং বা মিলন ঘটিয়ে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এইসব কারণেই আর্মস্ট্রংকে নির্বাচিত করা হয়েছে

এই দুঃসাহসিক অভিযানের অধিনায়করূপে। তিনি হলেন কোটির মধ্যে একটি।

কিন্তু শুধু অবতরণ করলেই তো চলবে না। ফিরবার সময়, চাঁদের ভেলায় ক'রে উপরের কক্ষপথে উঠে এসে, চাঁদের ৭০ মাইল উপরে প্রদক্ষিণরত মূল মহাকাশযানের সঙ্গে মিলতে হবে নির্ভুল ভাবে। আর এটাই হ'ল সবচেয়ে কঠিন সমস্যা। এ সম্পর্কে আর্মস্ট্রং বলেছেন,—"মহাকাশে দু'টি মহাকাশযানকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে মিলন ঘটানো (ডকিং), একাজ অনেকটা অন্ধকার রাত্রে মাত্র আধ-পাঁট (¼ লিটারেরও কম) পেট্রোল সম্বল ক'রে একটি চলমান ডেকের গায়ে নৌকা ভেড়ানোর মতো।"

সুতরাং এত মহড়া সত্ত্বেও অবতরণের এবং আরোহণের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে মহাকাশচারীদের উপর। কারণ, ভুল-ত্রুটি এবং অসাফল্যের সম্ভাবনা পদে পদে। যদিও রাডার, কম্পিউটার প্রভৃতি যন্ত্রপাতি একাজে তাদের সাহায্য করবে, তবুও এর অনেক-খানি নির্ভর করবে মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়াসের উপর, অর্থাৎ চালকের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উপর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর মানুষের চন্দ্রে অবতরণ

১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ স্বপ্ন দেখছে, কবে সে পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে পাড়ি দেবে চাঁদের দিকে। যা এতদিন ছিল স্বপ্ন তা-ই বাস্তবে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তিনটি মানুষকে নিয়ে অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযান তার ঐতিহাসিক যাত্রা-পথে বেরিয়ে পড়লো। শুরু হ'ল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর অভি-যান। এবারকার অভিযানের মূল লক্ষ্য—চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ। মাত্র পনরো বছর আগেই এ ছিল নিছক কল্পনা।



চিত্র ৪২

অ্যাপোলো-১১ অভিযানের অধিনায়ক মার্কিন মহাকাশচারী নীল এ. আর্মস্ট্রং—পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি চাঁদের মাটিতে পা ফেলবার গৌরব অর্জন করেছেন (২১শে জুলাই, ১৯৬৯)।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

ফ্লোরিডার কেপ্ কেনেডি, ভারতীয় সময় বুধবার সন্ধ্যা ৭টা ২ মিনিট। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় দূরবর্তী কনট্রোল থেকে বোতাম

টেপা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে উৎক্ষেপণ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় ৩৬৪ ফুট উঁচু স্যাটার্ন-৫ রকেটের নিম্নভাগ থেকে লক্‌লক্‌ ক'রে আগুনের শিখা বেরিয়ে এসে সমস্ত কিছু ঢেকে ফেললো—এবং সেই সাদা ও কমলা রঙের অগ্নিস্তম্ভের ভেতর থেকে প্রায় চার হাজার টন ওজনের যন্ত্র-দানবটি পৃথিবীর মাটি ছেড়ে আকাশে উঠলো। তার চূড়ায় একটি কুঠুরির মধ্যে রয়েছেন নীল এ. আর্মস্ট্রং (অধিনায়ক), এডুইন ই. আলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্‌স। যন্ত্র-দানবটি প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ টন হিসেবে জ্বালানি গিলে চলল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ৯২ হাজার রেল ইঞ্জিনের, অথবা ৫ লক্ষ মোটর গাড়ির শক্তি নিজের বুকের মধ্যে সঞ্চয় ক'রে নিয়ে অতলান্তিকের আকাশপথে দক্ষিণদিকে ছুটে চললো। কয়েক সেকেণ্ড বাদে তাকে আর দেখা গেল না,—সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।



চিত্র ৪৩
মার্কিন মহাকাশচারী এডুইন ই. আলড্রিন। ইনিও চাঁদের মাটিতে পা ফেলার গৌরব অর্জন করেছেন (২১শে জুলাই, ১৯৬৯)।
[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

প্রথম পর্যায়ের রকেট জ্বললো মাত্র সোয়া দু'মিনিট, তারপর তা আপনা থেকে খসে পড়ে গেল। তারপর যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটের প্রজ্বলন শুরু হ'ল, অমনি রকেট উৎক্ষেপণে মহাকাশচারীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত 'লঞ্চ এস্কেপ টাওয়ার'-এর প্রয়োজন

ফুরালো, তাই তা খসে পড়লো। তারপর একসময় দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেটও বিদায় নিলো।

ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পর এগারো মিনিটের কিছু বেশী সময় পরে অ্যাপোলো আফ্রিকার পূর্বাকাশে গিয়ে পৃথিবীর উপরের কক্ষপথে প্রবেশ ক'রল।

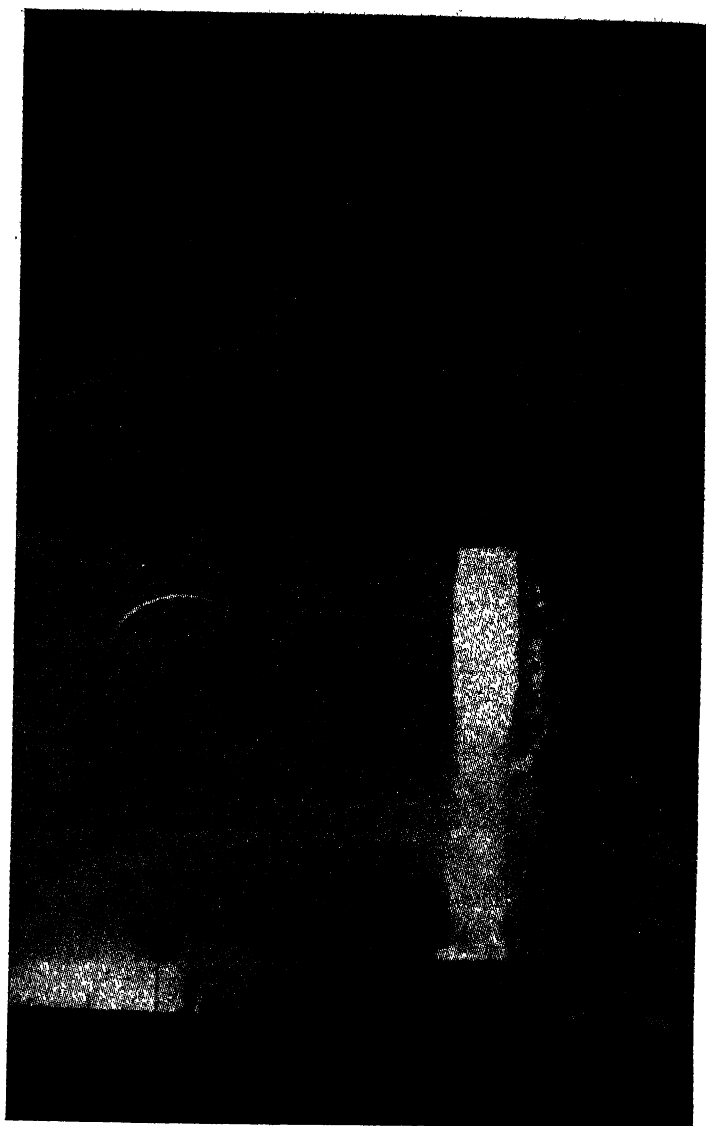
অ্যাপোলো-১১ ঘণ্টায় ১৭,৫০০ মাইল বেগে ১১৯ মাইল উঁচুতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু ক'রল। আকাশে ওঠার পরই অ্যাপোলো-১১-এর অধিনায়ক আর্মস্ট্রং জানালেন যে, তাঁরা সঠিক পথে চলেছেন।



চিত্র ৪৪
মার্কিন মহাকাশচারী মাইকেল কলিন্স্। আর্মস্ট্রং এবং আল্ড্রিন যখন 'ঈগল'-এ চড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, তখন ইনি কলম্বিয়ায় চড়ে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে থাকেন।
[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

এরপর প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে অ্যাপোলো পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রল এবং মাত্র দেড়বার পৃথিবী প্রদক্ষিণের পর অস্ট্রেলিয়ার আকাশে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে রকেটের তৃতীয় পর্যায় চালু ক'রে অ্যাপোলোকে গতিবেগ দেওয়া হ'ল ঘণ্টায় ২৪,২০০ মাইল। এই বিপুল গতিবেগ তাকে পৃথিবীর উপরের কক্ষপথ থেকে ছিটকে বের করে দিল চাঁদের দিকে।

রকেটের তৃতীয় পর্যায়টি জ্বললো ৫ মিনিট ২০ সেকেণ্ড এবং অ্যাপোলোকে পৃথিবীর অভিকর্ষবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে তাকে ঠেলে দিল চাঁদের পথে। চাঁদের পথে যাত্রার কয়েক সেকেণ্ড পরে মহাকাশচারীরা



চিত্র ৪৫। ফ্লোরিডার কেপ্ কেনেডি—তিনজন মানব-আরোহীসহ প্রায় ৩৬৪ ফুট উঁচু এবং প্রায় চার হাজার টন ওজনের স্যাটার্ন-৫ রকেট পৃথিবীর মাটি ছেড়ে আকাশে উঠলো। ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হ'ল।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

চিত্র ৪৬। অ্যাপোলো-১১-এর গতিপথ।

1. তিনজন মানব-আরোহীসহ স্যাটার্ন-৫ রকেট কেপ্ কেনেডি থেকে যাত্রা ক'রল; 2. রকেট পৃথিবীর উপরের কক্ষপথে গিয়ে প্রবেশ ক'রল; 3. তৃতীয় পর্যায়ের রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে অ্যাপোলো পৃথিবীর উপরের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে গেল, চাঁদের দিকে যাত্রা শুরু হ'ল; 4. মূল মহাকাশযান 'কলম্বিয়া' চাঁদের ভেলা 'ঈগল'কে তার গ্যারেজ থেকে বের ক'রে নিয়ে এল; 5. রকেট চালিয়ে অ্যাপোলোর গতিপথ সংশোধন ক'রে নেওয়া হ'ল; 6. উল্‌টো দিকে রকেট চালিয়ে অ্যাপোলো চাঁদের উপরের কক্ষপথে গিয়ে প্রবেশ ক'রল; 7. চাঁদের ভেলা মূল মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু দু'টোই পাশাপাশি থেকে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করছে; 8. চাঁদের ভেলা চাঁদের দিকে নামতে শুরু ক'রল; 9. চাঁদের ভেলা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে; 10. চাঁদের ভেলা মূল মহাকাশযানের সঙ্গে মিলিত হ'ল; 11. চাঁদের ভেলা মহাকাশে পরিত্যক্ত হ'ল; 12. রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে অ্যাপোলো চাঁদের উপরের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে এল, পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু হ'ল; 13. রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে অ্যাপোলোর গতিপথ সংশোধন ক'রে নেওয়া হ'ল; 14. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার আগেই ক্যাপ্‌সুলটি পৃথক্ ক'রে নেওয়া হ'ল; 15. তিনজন মানব-আরোহীসহ ক্যাপ্‌সুলটি প্যারাসুটে ভর ক'রে ধীরে ধীরে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে এল। A-B. মহাকাশে চাঁদের গতিপথ।

পৃথিবীতে খবর পাঠালেন,—"জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি।"

এরপর পৃথিবীর কনট্রোল থেকে সাংবাদিকদের জানানো হ'ল,—অ্যাপোলো নিখুঁতভাবে ছুটে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরেই মহাকাশচারীরা তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেললেন। এরপর 'কম্যাণ্ড মডুল'কে ঘুরিয়ে 'চাঁদের ভেলা'-র সঙ্গে মুখোমুখি জুড়লেন এবং তাকে তার গ্যারেজ থেকে বের ক'রে নিয়ে এলেন। তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে, চাঁদের ভেলাকে সামনে রেখে, অ্যাপোলো ছুটে চললো তার লক্ষ্যস্থলের দিকে।

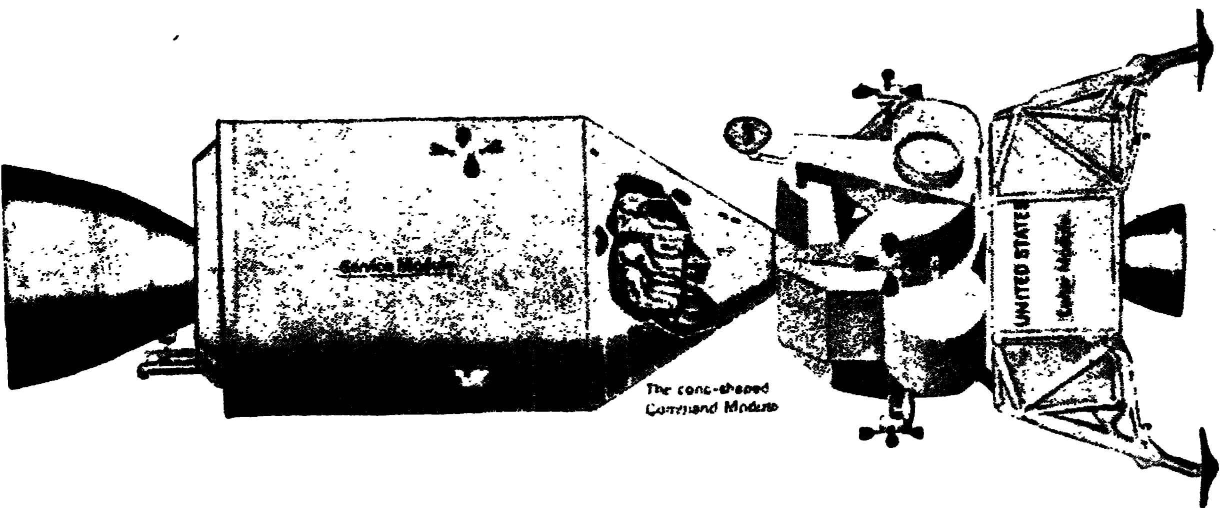
এ পর্যন্ত ওরা কথা বলেছেন খুব কম, যেটুকু না বললে চলে না সেইটুকুই। তাও বলেছেন পৃথিবীর কনট্রোলের সঙ্গে, শুধু নীরস যান্ত্রিক তথ্য নিয়ে।

কিন্তু পৃথিবীর অভিকর্ষ থেকে ছাড়া পেয়েই যেন অধিনায়ক আর্মস্ট্রং-এর মুখ খুলে গেল। তিনি কনট্রোলকে বললেন,—ঠিক এই মুহূর্তে জানালার ভিতর দিয়ে সমগ্র উত্তর আমেরিকা, আলাস্কা থেকে শুরু করে উত্তর মেরু এবং সেখান থেকে কিউবা উপকূল পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার, সকাল সাড়ে ছ'টা। অ্যাপোলো ১১-এর তিন মহাকাশচারী বিছানায় গেলেন। কেপ্ কেনেডি থেকে যাত্রার প্রায় ১২ ঘণ্টা পর এবং প্রায় ৬০ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে একটু অবসর, নিদ্রার কোলে একটু মাথা রাখা।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাঁরা প্রথম নৈশ ভোজন সেরে নিলেন। স্যামন (Salmon) মাছের স্যালাড, মুরগীর মাংস, ভাত, কেক, কলা এবং আঙ্গুরের রস। আহারটা নেহাত মন্দ হ'ল না।

এর আগে তাঁরা পৃথিবীর বুকে রঙিন ছবি পাঠিয়েছেন টেলিভিশনে। কিন্তু আল্ড্রিন তাঁর ক্যামেরার কাজে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হননি। তাই তিনি রসিকতা ক'রে বললেন—"হ্যালো



চিত্র ৪৭

অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযান। বাঁদিকে "সার্ভিস মডুল", মাঝখানে "কম্যাণ্ড মডুল" বা মূল মহাকাশযান (এর মধ্যে কাটা অংশে মহাকাশচারীদের অবস্থান দেখানো হয়েছে), আর ডানদিকে "লুনার মডুল" বা চাঁদের ভেলা।

[ইউ. এস. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

হিউসটন (Houston), পৃথিবীটাকে একটু ঘুরিয়ে দিতে পার! কত আর সমুদ্র দেখবো। এর চেয়ে আর একটু বেশী কিছু দেখতে চাই।"

নীল আর্মস্ট্রং বললেন,—"আমরা হাওয়াই দ্বীপ ভালভাবে দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমাদের চোখের সামনে উত্তর আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র……ক্যালিফোর্নিয়া……মেক্সিকো!"

ছবিগুলি তোলা হয় মহাকাশের ৬০ হাজার মাইল দূর থেকে। মহাকাশের কালো পর্দার পটে পৃথিবীকে একটি বিরাট নীল, সবুজ, সাদায় মেশানো বলের মতো মনে হচ্ছিল।

রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে মহাকাশচারীরা ছোট্ট একটি রকেট চালালেন। এর ফলে অ্যাপোলো তার অক্ষের উপর ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে লাগল। মহাকাশযানের ভিতরে উষ্ণতা যাতে একই থাকে, এতে তারই ব্যবস্থা হ'ল।

মহাকাশচারীরা একটানা আট ঘণ্টা ঘুমালেন। ভারতীয় সময় বিকেল চারটে নাগাদ তাঁরা ঘুম থেকে উঠলেন। উঠেই ব্রেকফাস্ট —ফলের স্যালাড, টোস্ট, চকোলেট এবং ফলের রস।

বৃহস্পতিবার, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার খবর,—অ্যাপোলো পৃথিবী থেকে এক লক্ষ মাইল দূরে চলে গিয়েছে।

হিউস্টন, ১৮ই জুলাই—ফ্লাইট ডায়নামিক অফিসার ডেভিড রীড বলেছেন,—"গতরাত্রে মহাকাশযানের গতিপথের সামান্য ত্রুটি সংশোধনের জন্যে একটি রকেট ব্যবহার করা হয়। এর ফলে অ্যাপোলোর গতিবেগ একটু বেড়ে গেছে। আর এজন্য নির্দিষ্ট সময়ের তিন মিনিট আগেই সে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করবে।"

অন্যান্য খবরের মধ্যে আছে, মহাকাশচারীরা নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে নিয়েছেন। মহাকাশযান লক্ষ্যভেদী বাণের মতো চাঁদের কক্ষপথের দিকে ছুটে চলেছে। এমনি নির্ভুল তার গতিপথ যে, চাঁদের কক্ষপথে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গতিপথের আর

বিন্দুমাত্রও রদবদল করার প্রয়োজন হবে না,—যদিও সেরকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

১৯শে জুলাইয়ের খবর,—ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ৪২ মিনিটে অ্যাপোলো-১১ চাঁদের অভিকর্ষ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই তৃতীয়বার মানব-আরোহীসহ মহাকাশযান পৃথিবীর প্রভাব ছাড়িয়ে চাঁদের রাজ্যে প্রবেশ ক'রল।

ভারতীয় সময় দুপুর ১২টা ২ মিনিট। অ্যাপোলো চাঁদের ২৯,৯০০ মাইলের মধ্যে চলে গিয়েছে, গতিবেগ ঘণ্টায় ২,৬০০ মাইল। এরপর মেলবোর্ন থেকে খবর এল, মহাকাশচারীরা এখন চাঁদের রাজ্যে কক্ষপথে প্রবেশের জন্য তৈরি হচ্ছেন। এই সময় তাঁরা চাঁদকে দেখলেন। তাঁরা বললেন,—কী সুন্দর ওই ছবি! আর্মস্ট্রং জানালেন,—চাঁদ এখন সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। এখন পৃথিবীর আলোকে চাঁদ আলোকিত। তিনি আরও জানালেন,—সূর্যের চতুর্দিকের জ্যোতির্বলয় দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে শুধু গ্যাস। এটা যেন একটা ভূতুড়ে দৃশ্য।

ভারতীয় সময় রাত ৭টা ২ মিনিট। অ্যাপোলো চাঁদ থেকে ১১,৭৪৩ মাইল দূরে, গতিবেগ ঘণ্টায় ২,৮৬০ মাইল। রাত ১০টা ৩৩ মিনিটে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে অ্যাপোলো-১১-কে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হ'ল। এর দশ মিনিট পরে, রাত ১০টা ৪৩ মিনিটে, অ্যাপোলো-১১ চাঁদের পেছন দিকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে পৃথিবীর বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

চাঁদের ভেলাটি নাকের ডগায় নিয়ে, রাত ১১টা ১৭ মিনিটে অ্যাপোলো-১১ চাঁদের পেছন দিক থেকে আবার এপিঠে দেখা দিল। এই ৩৪ মিনিট হিউসটনের নিয়ন্ত্রণকারীদের সঙ্গে মহাকাশ-চারীদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। আর এই সময়ের মধ্যেই মহাকাশচারীরা মহাকাশযানের গতিবেগ কমিয়ে আনেন।

এর পরের খবর, একটি রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে অ্যাপোলো-১১

চাঁদের উপরের কক্ষপথে গিয়ে প্রবেশ করেছে। এর দরুন চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম অবতরণের ব্যাপারে কাজ আরও কিছুটা এগিয়ে গেল।

রবিবার, ২০শে জুলাই, ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিট। ভেলার নাবিক আলড্রিন একটি সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভেলায় ঢুকলেন—অ্যাপোলো তখন চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে।



চিত্র ৪৮

একটি রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে অ্যাপোলো-১১ চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ ক'রল।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

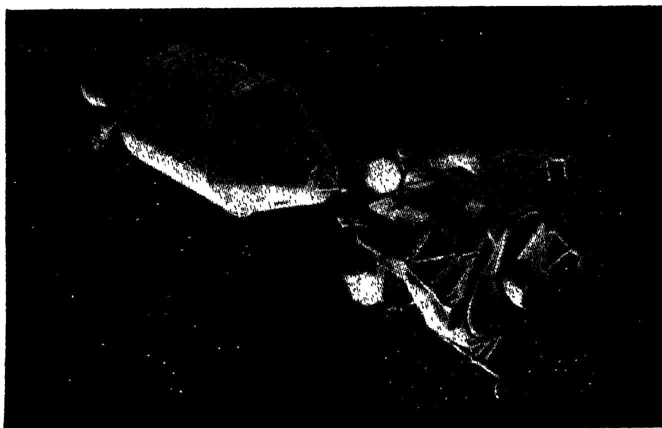
এর ২৫ মিনিট পরে সেই সুড়ঙ্গ-পথে একইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেন অধিনায়ক আর্মস্ট্রং। দু'জনে মিলে ভেলার যন্ত্রপাতিগুলি সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ক'রে নিলেন। হ্যাঁ, প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি ঠিক আছে—হিউসটনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে সে সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

সেখানে কয়েক হাজার বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্ ও চিকিৎসক বসে আছেন তাঁদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য। চীফ মেডি-ক্যাল অফিসার ডাঃ বেরি এবং তাঁর সহকর্মীরা মহাকাশচারীদের

হৃদ্‌স্পন্দন, রক্তের চাপ, মস্তিষ্কের স্থিরতা সব কিছু দেখে নিলেন। হার্টের অবস্থা জানবার জন্য, প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূর থেকে 'ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিওগ্রাফ' নেওয়া হ'ল। 'চমৎকার'! চিকিৎসকরা বললেন,—'হ্যাঁ, এগোতে পার'।

ভারতীয় সময় রাত ১১টা ১৮ মিনিট বাজার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের ভেলা 'ঈগল' মূল মহাকাশযান 'কলম্বিয়া' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁরা তখন চাঁদের ওপিঠে।

বিচ্ছিন্ন হলেও 'ঈগল' 'কলম্বিয়া'-র পাশে থেকেই চন্দ্র প্রদক্ষিণ করতে থাকল; চাঁদের এপিঠে পৃথিবীর সামনে এসে অধিনায়ক আর্মস্ট্রং খবর পাঠালেন,—আমাদের ঈগল পাখির চমৎকার দু'টি পাখা আছে।



চিত্র ৪৯

চাঁদের ভেলা "ঈগল" মূল মহাকাশযান "কলম্বিয়া" থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

নীচে, প্রায় ৭০ মাইল (১১০ কিলোমিটার) নীচে, বন্ধুর, ভাঙ্গাচোরা উপলখণ্ড সমাকীর্ণ আগ্নেয় পর্বত। চাঁদের নিরক্ষরেখা

বরাবর ভেলাটি এগিয়ে চলেছে। দূরে অ্যাপেনাইন পর্বতশিখর, তার দক্ষিণপ্রান্ত জুড়ে অশ্রু-সাগর, একটির পর একটি দৃশ্য আসছে, আর সরে যাচ্ছে। তাঁরা চন্দ্র প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছেন।

'শান্ত-সাগর', যেখানে তাঁরা অবতরণ করবেন, তার উপর দিয়েও 'ঈগল' কয়েকবার উড়ে গেল।

এরপর একসময় পৃথিবী থেকে 'কলম্বিয়া' মারফত নির্দেশ গেল, এবার 'শান্ত-সাগর'-এর তটভূমির দিকে ভেলার মুখ ঘুরিয়ে নাও। তারপর জ্বালাও রকেট।

ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৪৪ মিনিটে সেই রোমহর্ষক এবং কল্পনাতীত বিপজ্জনক অধ্যায় শুরু হ'ল। তাঁরা রকেট-ইঞ্জিন চালু ক'রে নীচে চাঁদের দিকে নামতে শুরু করলেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠের ৭০ মাইল উপরে চাঁদের আকাশে প্রদক্ষিণরত 'কলম্বিয়া' থেকে কলিন্‌স খবর পাঠালেন, সব কিছু নিখুঁতভাবে চলছে।

এই সময় হঠাৎ বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হিউসটনে নিদারুণ উদ্বেগ। ফ্লাইট ডিরেক্টর ইউজিন ক্রানজ্ ধীর স্থির মানুষ, কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। বেশ সংযতভাবে তিনি বললেন,—সবাই তাকিয়ে থাকো যন্ত্রের দিকে, মিটারের দিকে, গ্রাফের দিকে—কোন কথা নয়, ফিসফিসানি নয়!···হ্যাঁ, তোমাদের প্রতি শুভেচ্ছা, সকলের প্রতি শুভেচ্ছা, মহাকাশে চাঁদের রাজ্যে আমাদের তিনটি মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা।

ঠিক সেই মুহূর্তে কলিন্‌স কলম্বিয়ায় চেপে আবার চাঁদের এপিঠে চলে এলেন। বললেন,—ঈগল নামছে, হেলিকপ্‌টার যেমন ক'রে মাটিতে নামে, পাখি যেমন ক'রে সামান্য একটু কাত হয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে, ঠিক তেমনই নামছে······নামছে, ওই তো আমি দেখতে পাচ্ছি—কুৎসিত, বিদঘুটে, চার ঠ্যাং-ওয়ালা 'ঈগল' ওদের দু'জনকে নিয়ে সুন্দরভাবে নামছে।

বিরাট সূর্যমণ্ডল তখন চাঁদের সঙ্গে কোণাকুণি ভাবে রয়েছে। সূর্যের আলোয় মসীকৃষ্ণ ছায়া পড়েছে চন্দ্রমণ্ডলে। নভোমণ্ডলে সূর্যের এরূপ অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চাঁদে নামার সময়টি নির্দিষ্ট হয়েছে। কারণ এরূপ আলো-ছায়া থাকায়, অভিযাত্রীরা পাহাড়-পর্বত, বিপদসঙ্কুল গহ্বর সব স্পষ্ট দেখতে পাবেন, সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

পৃথিবীতে ফিরে এসে এই ঐতিহাসিক অবতরণ সম্পর্কে নীল আর্মস্ট্রং যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি রোমাঞ্চকর। তিনি বলেছেন,—

"অবতরণের সময় রকেটের প্রজ্বলন হ'ল নিখুঁত এবং ঠিক সময় মতো। এটি ঘটলো চন্দ্রপৃষ্ঠের নির্দিষ্ট জায়গাটির উপরেই, অর্থাৎ মেরিলিন পর্বতের পশ্চিম শিরার ঠিক উপরেই। আমরা তখন মুখ নীচের দিকে ক'রে প্রায় ৫০,০০০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। মেরিলিন পর্বত এবং অন্যান্য সুপরিচিত চিহ্নের অবস্থান দেখে মনে হচ্ছিল, আমরা নির্বাচিত জায়গার কাছাকাছি কোথাও অবতরণ করতে সক্ষম হ'ব।

কিন্তু ৩০,০০০ ফুট উঁচুতে থাকতেই কম্‌পিউটার নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। হঠাৎ এতে বিপদ-সূচক লাল আলো জ্বলে উঠলো। পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে এর কারণ অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল, অত্যধিক কাজ করার ফলে কম্‌পিউটার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে এখন কাজ করতে অক্ষম। সঙ্গে সঙ্গে হিউসটনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হ'ল, যন্ত্রের নির্দেশ অগ্রাহ্য ক'রেই নেমে যেতে হবে।

যতক্ষণ ৩০,০০০ ফুট থেকে ৫,০০০ ফুট পর্যন্ত নেমেছি, ততক্ষণ আমরা যন্ত্রপাতিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে এত গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হয়েছিলাম যে, আমাদের মনোযোগ মহাকাশযানের জানালা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের চিহ্নগুলি থেকে সরে গিয়েছিল। আবার

যখন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম, তখন আমরা ৩,০০০ ফুটেরও নীচে নেমে গেছি। তখন চাঁদের দিগন্ত এত নিকটবর্তী ছিল (এটাই চাঁদের বিশেষত্ব) যে, বেশী দূরের কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। একটি চিহ্ন যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'ল, তা হ'ল বিরাট এবং খুবই চিত্তাকর্ষক একটি জ্বালামুখ। পরবর্তীকালে একে West crater বা পশ্চিম-জ্বালামুখরূপে সনাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তখন আমরা একে ঠিকমত চিনতে পারিনি। প্রথমেই আমরা স্থির করলাম যে, আমরা এর আগেই নেমে পড়বো। স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আমাদের সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে ব'লে মনে হ'ল।

কিন্তু আমরা যখন প্রায় ১,০০০ ফুটে নেমেছি, তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, 'ঈগল' একটা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত এলাকায় নামতে যাচ্ছে। কিনারা দিয়ে ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য পাথরের চাঁই, তাদের এক-একটি যাত্রীবাহী গাড়ির মতোই বড়।

মনে হ'ল, পাথরগুলো যেন ভয়ংকর দ্রুতবেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আমার মনোযোগ সঙ্গে সঙ্গে জানালা থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে এল যন্ত্রের দিকে। এদিকে আল্‌ড্রিন ক্রমাগত কম্‌পিউটার এবং অন্যান্য যন্ত্র-সংক্রান্ত তথ্যাদি হেঁকে চলেছেন। প্রায় ৪০০ ফুটে এসে যখন ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে চলেছি, তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, স্বয়ংক্রিয়-ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রে থাকলে আর চলবে না। কিছুটা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা নিজের হাতেই নিয়ে নিতে হবে। সুতরাং সেইভাবে 'ঈগল'-এর অবস্থান এবং গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম।

'ঈগল' তার চারটে পা নীচের দিকে ক'রে চন্দ্রপৃষ্ঠের উপর দিয়ে সমান্তরালভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। আমরা পাথরের চাঁইগুলোর উপর দিয়ে ভেসে চললাম এবং অবতরণের উপযোগী একটা ভালো জায়গার জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে লাগলাম। আমি পর পর কয়েকটি জায়গা নির্বাচন করলাম, কিন্তু বার বার মত

পরিবর্তন করতে বাধ্য হ'লাম। একটি জায়গা হয়তো ভালো মনে হ'ল, কিন্তু কাছে গিয়ে তাকে আর তেমন আকর্ষণীয় ব'লে মনে হ'ল না। শেষ পর্যন্ত যে জায়গাটা নির্বাচন ক'রলাম, তা একটি বাড়ি তৈরির উপযোগী জমির মতো, বর্গক্ষেত্রের মতো এই জমিটির বাহুর মাপ মাত্র ২০০ ফুটের মতো হবে। এর একদিকে রয়েছে কয়েকটি বড় বড় জ্বালামুখ আর অন্যদিকে মাঠভর্তি ছোট ছোট পাথর। তবুও মনে হ'ল এখানে নামা যাবে। তাই 'ঈগল'-কে সেইদিকে নিয়ে গেলাম।"

তারপর এল সেই চরম মুহূর্ত। ভারতীয় সময় রাত ১টা ৪৮ মিনিটে 'ঈগল', আর্মস্ট্রং ও আল্‌ড্রিনকে নিয়ে, চাঁদের মাটিতে নামল। এমন কিছু চোটও তাঁদের গায়ে লাগল না। শান্ত-সাগরের তীরে সমতলভূমির উপর মাকড়সার মতো চারটি পা ছড়িয়ে দিয়ে 'ঈগল' বেশ শক্তভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। চাঁদের শান্ত-সাগর থেকে ভেসে এল প্রথম মানুষের কণ্ঠস্বর,—"হ্যালো পৃথিবী, চাঁদ থেকে বলছি, আমি পৃথিবীর মানুষ। হ্যাঁ, এই মাত্র চাঁদের ভেলা 'ঈগল-'এ চেপে আমরা এখানে নামলাম, আমি নীল আর্মস্ট্রং আর আমার সঙ্গী আল্‌ড্রিন। নামবার সময় সামান্য ধুলোর মেঘ সৃষ্টি হ'ল। খুব সম্ভবত ভেলার ইঞ্জিনটিই এজন্য দায়ী।"

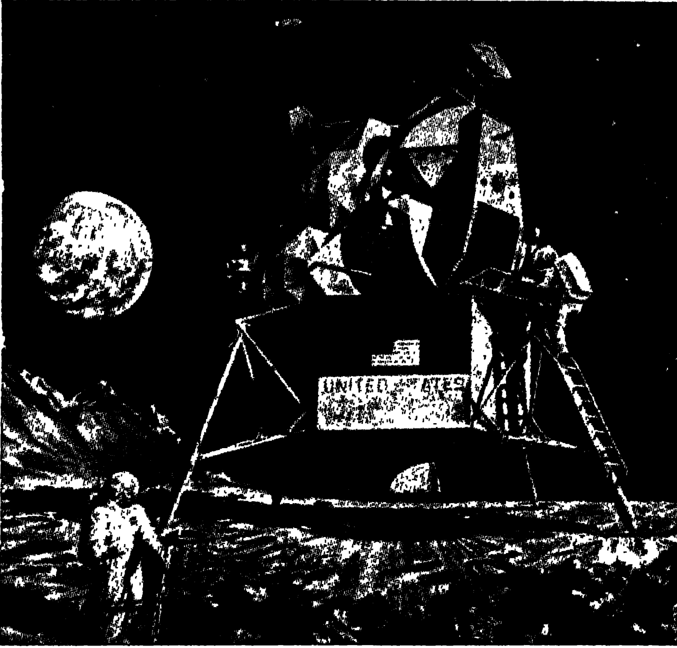
ভেলার জানালায় দাঁড়িয়ে আর্মস্ট্রং পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রকে বললেন,—"মাফ করবেন, নামতে বোধ হয় একটু বেশী সময় লাগলো। চারদিকে কেবলই গিরিখাদ, শিলাখণ্ড, নামবার উপযুক্ত স্থান বেছে নিতে একটু সময় লাগলো।"

আল্‌ড্রিন জানালার পাশে এসে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে বললেন,—"যত রকমের পাথর থাকতে পারে, সব দেখতে পাচ্ছি। একদিক থেকে পাথরগুলির যে রং দেখা যাচ্ছে, অন্যদিক দেখলে তা সম্পূর্ণ আলাদা।"

সোমবার, ২১শে জুলাই, ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ২৬ মিনিট

২০ সেকেণ্ড, মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবের, সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত—ঠিক তখনই পৃথিবীর মানুষ চাঁদের বুকে প্রথম পদচিহ্ন এঁকে রেখে এল—যুগ-যুগান্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কোনদিন হয়তো এই চিহ্ন মুছে যাবে না। চাঁদ অনন্তকাল এই চিহ্ন বুকে নিয়ে জেগে থাকবে।

চাঁদের ভেলার ঢাকনা খুলে যে মুখখানা প্রথমে বেরিয়ে এল,



চিত্র ৫০

চাঁদের ভেলা 'ঈগল' শান্ত-সাগর অঞ্চলে চাঁদের জমিতে অবতরণ করেছে। প্রথম চন্দ্রচারী নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটি সংগ্রহ করছেন, আর দ্বিতীয় জন এডুইন আলড্রিন সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। নিকষ কালো মহাকাশের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে বিরাট পৃথিবী, আর উপরে আকাশে দেখা যাচ্ছে মূল মহাকাশযান 'কলম্বিয়া'—এর মধ্যে রয়েছেন তৃতীয় মহাকাশচারী মাইকেল কলিন্‌স।

[ইউ. এস্‌. আই. এস্‌.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

সেটা অধিনায়ক আর্মস্ট্রং-এর মুখ। ভেলাটির এক পায়ের সঙ্গে একখানা মই ঝোলানো রয়েছে। তারই দু'টি সিঁড়ি বেয়ে তিনি খানিকটা নামলেন, তারপর উপরে হাত বাড়িয়ে টেলিভিশন ক্যামেরাটি এমন জায়গায় বসিয়ে দিলেন যেখান থেকে সে ঐতিহাসিক ব্যাপারটি দেখতে পারে এবং পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের সামনে সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি হাজির করতে পারে।



চিত্র ৫১
পৃথিবীর প্রথম মানুষ নীল আর্মস্ট্রং এইভাবে চাঁদের মাটিতে প্রথম পা ফেললেন।
[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

মইটির দিকে চোখ রেখে একটির পর একটি সিঁড়ি বেয়ে তিনি সব চাইতে নীচের সিঁড়িতে পা রাখলেন। সেখানে একটু দাঁড়ালেন, এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর বাঁ পা-টি আর একটু নামিয়ে দিয়ে মাটি তাঁর ভার সইতে পারবে কিনা, যাচাই করে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, ভয়ের কিছু নেই। পরমুহূর্তেই এক লাফে নেমে পড়লেন চাঁদের মাটিতে।

পৃথিবীর অগণিত মানুষ টেলিভিশনে দেখল,—চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর প্রথম মানুষ।

চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে আর্মস্ট্রং বললেন,—"That is one small step for a man, one giant leap for mankind." অর্থাৎ, এ হ'ল একটি মানুষের পক্ষে সামান্য একটি পদক্ষেপ, আর সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিরাট এক পদক্ষেপ।

ক্যামেরায় স্পষ্ট ধরা পড়লো, চাঁদের মাটিতে তাঁর পা বসে যাচ্ছে। আর্মস্ট্রং বলেন,—"হ্যাঁ, চাঁদের ধূসর মাটিতে আমার পা এক কি দুই ইঞ্চি প্রায় বসে যাবার উপক্রম হয়েছিল, তবে পরে আর অসুবিধা হয়নি।"

প্রথমেই যে নুড়িটি সামনে পাওয়া গেল, তাই কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে তুললেন আর্মস্ট্রং। মাটির দিকে ঝুঁকে পাথর কুড়োতে তাঁর বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তবুও এক মুঠো মাটি তুলে পকেটে রাখলেন।

তখন সূর্যের আলোয় তাঁর ছায়া তাঁর চেয়ে প্রায় ছ'গুণ বড় (৩৫ ফুট) দেখাচ্ছিল, তাঁর শরীর থেকে যেন ফস্‌ফরাসের মতো আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আর তাঁর সাদা মহাকাশ-পোশাকে চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে অনিশ্চিত পদক্ষেপে টলতে টলতে এগিয়ে চললেন। আলড্রিনকে জিজ্ঞেস করলেন,—আমি ঠিক ঠিক এগুচ্ছি তো?

'ঈগল'-এর ভিতর থেকে আলড্রিন বললেন,—আপনি খুব সুন্দর-ভাবে এগিয়ে চলেছেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠ কেমন? এ সম্পর্কে আর্মস্ট্রং বললেন,—বালুকাময়, নুড়িতে আকীর্ণ। তবে চলে ফিরে বেড়াতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।......আমরা বরং মসৃণ সমতলেই হেঁটে বেড়াচ্ছি।...... আমেরিকার পশ্চিম মরুভূমি যেমন দেখতে, চাঁদের ধূসর ভূমি অনেকটা সেই রকম। যেন একটা বড় ফুটবলের মাঠ। তবে খুব সুন্দর।

আর্মস্ট্রং আরও বললেন,—কেমন যেন ছায়া-ছায়া অন্ধকার।



চিত্র ৫২

চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন—যুগ-যুগান্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কোনদিন হয়তো এই চিহ্ন মুছে যাবে না। চাঁদ অনন্তকাল এই চিহ্ন বুকে নিয়ে জেগে থাকবে।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

কোথায় পা ফেলছি, ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছি না। অথচ চোখ তুললেই চাঁদের ভেলাটিকে দেখতে পাচ্ছি। উপরের সব-কিছু স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

পৃথিবীতে ফিরে এসে আর্মস্ট্রং বলেছেন,—"চাঁদের বুকে আলোর খেলা ভারি অদ্ভুত। মনে হয়, ক্ষণে ক্ষণে তার রং বদলে যাচ্ছে। এর কারণ আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝে উঠতে পারিনি। সূর্যরশ্মি বরাবর নিজের ছায়ার দিকে তাকালে চন্দ্রপৃষ্ঠ তামাটে ব'লে মনে হয়। কিন্তু সোজা নীচের দিকে, বিশেষ ক'রে ছায়ার মধ্যে, তাকালে চন্দ্রপৃষ্ঠ দেখায় মিশমিশে কালো। চাঁদের মাটি হাতে ক'রে তুলে নিলে তা মলিন, ধূসর অথবা কালো দেখায়। সাধারণভাবে এ জিনিস খুব মিহি, অনেকটা ময়দার গুঁড়োর মতো, কিন্তু কতক-গুলোর দানা মোটা বালির মতো। তবে সেখানে অবশ্যই সব রকম আয়তনের পাথর এবং পাথরকুচি ছড়ানো রয়েছে।"

চির নিঃশব্দতা ও নীরবতার রাজ্যে আর্মস্ট্রং একাই পা ফেলে চললেন—বিশ মিনিট। বিশ মিনিট পরে আল্‌ড্রিন ভেলা থেকে নেমে এসে তাঁর সঙ্গী হলেন। ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁরা চলতে শুরু করলেন। মনে হচ্ছিলো, কালো গুঁড়োর মতো কি যেন তাদের জুতোর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে।

পরে আল্‌ড্রিন বলেছেন,—"আমার একটা কাজ ছিল, চন্দ্রপৃষ্ঠে হেঁটে চলার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি কি, তা নির্ণয় করার জন্য চেষ্টা করে দেখা। দেখা গেল, আমরা এখানে যেভাবে হাঁটতে অভ্যস্ত, অর্থাৎ এক পা পেছনে রেখে এবং এক পা আগে ফেলে, ওখানেও সেইটাই সবচেয়ে ভালো; এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। ক্যাঙ্গারুর মতো দু'পা একসঙ্গে ক'রে লাফিয়ে লাফিয়েও চলা যাচ্ছিল, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে, তাতে গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কম থাকছিল। বড় বড় পা ফেলে হেঁটে চলাটাই সবচেয়ে ভালো ব'লে মনে হচ্ছিল।

এই অদ্ভুত, দেখতে পাউডারের মতো, চন্দ্রপৃষ্ঠে আমাদের পা কোথায় কতটা বসে যাচ্ছিল তার কোনো স্থিরতা ছিল না। অনেক জায়গায়ই আমাদের পা বসছিল এক ইঞ্চিরও ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু কতকগুলি গর্তের কিনারা দিয়ে অপেক্ষাকৃত গভীর নরম স্তর পাওয়া যাচ্ছিল, সে-সব জায়গায় আমাদের বুট-জুতো তিন চার ইঞ্চি বসে যাচ্ছিল। এর ফলে আমাদের পা পিছলে যাচ্ছিল। এজন্য আমরা যতটা সম্ভব সমান জমির উপর দিয়েই চলতে চেষ্টা করছিলাম। ছয় থেকে আট ইঞ্চি মাপের পাথরও সহজেই স্থানচ্যুত করা যাচ্ছিল। এসব মাটির মধ্যে শক্তভাবে আটকে রয়েছে, এরূপ মনে হয়নি।"

সময় সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাঁদের অনেক কাজ। প্রথমেই চন্দ্র-বিজয়ের স্মারক-ফলকটি বেশ জোরের সঙ্গেই পড়লেন আর্মস্ট্রং—বেতারে পৃথিবীর মানুষ তা শুনতে পেল।

"১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পৃথিবী গ্রহ থেকে আগত মানুষ এখানে প্রথম পদার্পণ করেছিল। আমরা এখানে এসেছিলাম সমগ্র মানবজাতির শান্তি-কামনায়।"

হাতে আরও কত কাজ! সময় মাত্র দু'ঘণ্টা। এর পরে অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে। দেহের ক্লান্তি যত বাড়বে, অক্সিজেনের খরচও তত বাড়বে। এই অবস্থায় বে-হিসেবী হওয়া চলে না।

তারপর তাঁরা দু'জনে মিলে শত কোটি বছরের মরুপ্রান্তরে মার্কিন পতাকা পুঁতে দিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস থেকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁদের ডাকলেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা চলল তিন মিনিট। তারপর আরও পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ভেলায় তুলে রেখে আর্মস্ট্রং ফিরে এলেন। তাঁরা যেন চাঁদের রাজা হয়ে বসেছেন, এমনইভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শিলা-বৃষ্টির পরে শিশুদের মতো তাঁরা দু'জনে কাড়াকাড়ি ক'রে পাথর কুড়োতে লাগলেন।

সেখানে বড় বড় গর্তও ছিল না, আর বড় বড় পাথরের চাঁইও ছিল না। কিন্তু সেখানে নানা আকারের এবং নানা আয়তনের এবং সম্ভবত নানা উপাদানের অনেক পাথরের টুকরো ছিল।

আল্‌ড্রিন বলেছেন,—"চন্দ্রপৃষ্ঠে আমরা যে-সব কাজ করেছি, মাটির নমুনা সংগ্রহ করার যন্ত্রটি চাঁদের মাটিতে ঢোকানোই তাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ ব'লে মনে হয়েছিল। এর সাহায্যে



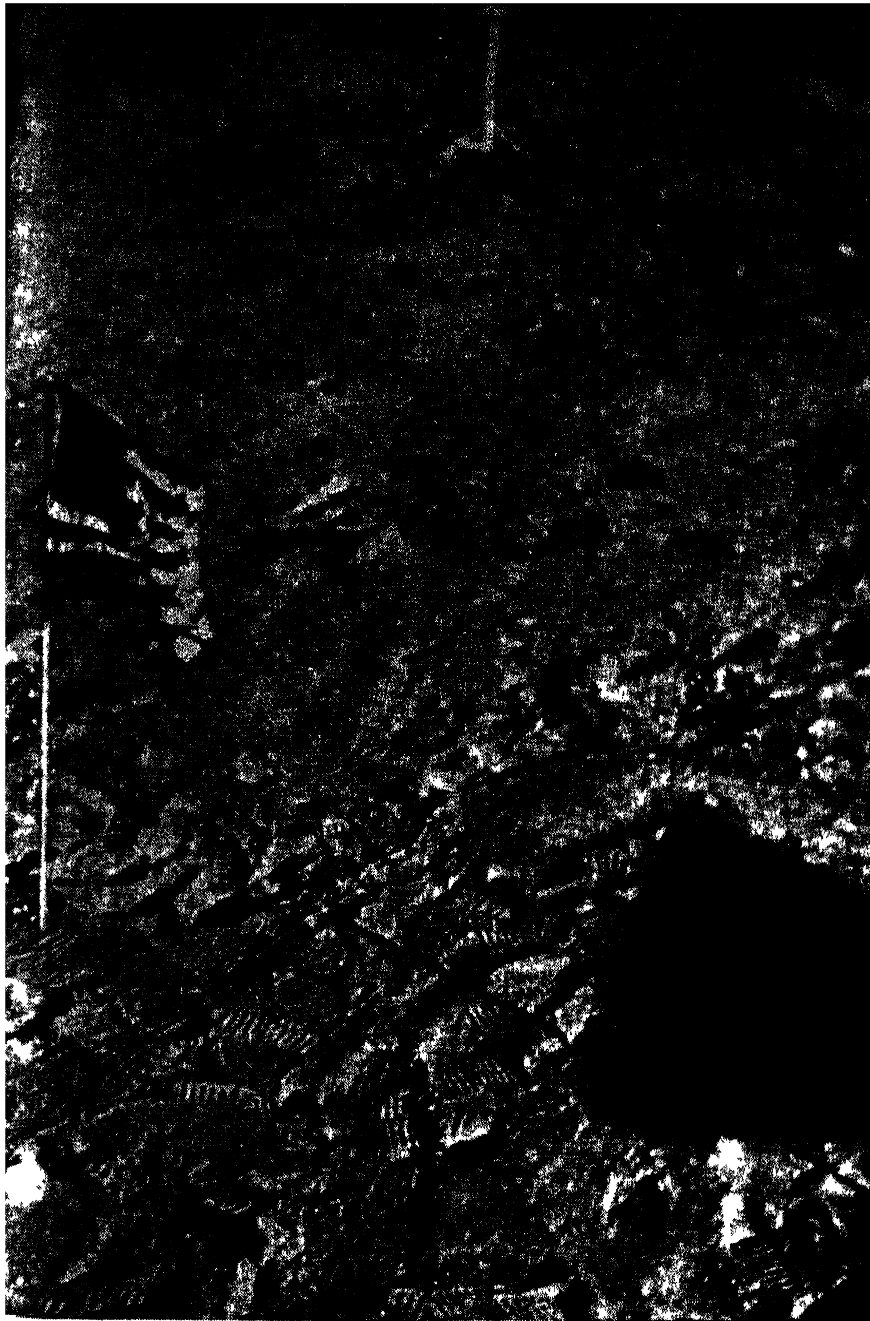
চিত্র ৫৩। মহাকাশচারীরা চন্দ্র-বিজয়ের এই স্মারক-ফলকটি চাঁদের বুকে রেখে এসেছেন।
[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

ছোট ছোট নলের মতো মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। উপরিভাগ এত নরম এবং পাউডারের মতো, আর তার কয়েক ইঞ্চি নীচেই মাটির বাধা এত বেশী যে তা খুবই বিস্ময়কর। মাটির নীচে সমাহিত কোনো পাথরের জন্যই যে এরূপ মনে হচ্ছিল, তা নয়। চাঁদের মাটি যেন ক্রমশ শক্ত হয়ে গেছে, আর মাত্র পাঁচ ইঞ্চি নীচেই সেটা সবচেয়ে প্রকট হয়েছে। আর একটি বিস্ময়কর খবর এই যে, মাটির এরূপ বাধা থাকা সত্ত্বেও তার পার্শ্বদেশের ধারণ-ক্ষমতা ছিল খুবই কম।

যন্ত্রটি মাটিতে ঢোকাতে গিয়ে খুব বাধা অনুভব করছিলাম, কিন্তু ঐ বস্তুই যন্ত্রটিকে পার্শ্বদেশে ধারণ ক'রে রাখতে পারছিল না। তা সামনে-পেছনে এপাশ থেকে ওপাশে নড়বড় করছিল। পতাকা-দণ্ডটি মাটিতে পুঁতবার সময়ও নীল এবং আমি ঠিক এই জিনিসই প্রত্যক্ষ করি।

চাঁদের এরূপ অদ্ভুত বাধার একমাত্র ব্যাখ্যা এই হ'তে পারে যে, প্রথমত বায়ুশূন্য অবস্থায় থাকাতে তা অত্যন্ত সংনমিত হয়ে গেছে। তদুপরি যুগ-যুগান্তর ধরে অসংখ্য উল্কার আঘাতে নীচের মাটি আরও সংনমিত হয়ে পড়েছে (ক্রমাগত হাতুড়ি পেটার ফলে যা হয়, তাই আর কি)। এইভাবে চাঁদের মাটি এত বেশী দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, সেখানে যন্ত্রের নলটি ঢোকাতে হ'লেও রীতিমত বল প্রয়োগ করতে হয়।"

কিন্তু সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে অক্সিজেনও। তাঁরা 'সিস্‌মোমিটার' যন্ত্র বসিয়ে দিলেন, তাতে ভূকম্পনের মতো চন্দ্র-কম্পন ধরা পড়বে। পৃথিবীতে বসেই বিজ্ঞানীরা তা জানতে পারবেন। একটি যন্ত্র বসালেন, এর সাহায্যে 'সোলার উইণ্ড' বা সৌর বাত্যার স্বরূপ নির্ণয় করা যাবে। আর বসানো হ'ল 'লেসার রিফ্লেক্‌টার'! উদ্দেশ্য, পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত আলোক প্রতিফলিত ক'রে চাঁদ-পৃথিবীর দূরত্ব সঠিক বলে দেবে। বাস্তবিক, ক্যালিফোর্নিয়া



চিত্র ৫৪। চাঁদের মাটিতে মার্কিন পতাকা। অদূরে একটি দণ্ডের উপরে দেখা যাচ্ছে টেলিভি
ক্যামেরা, আর ডান পাশে চাঁদের বুকে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রযানের কালো ছায়া।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে

থেকে একটি আলোক-সংকেত প্রায় সেই মুহূর্তেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল।

ভারতীয় সময় ১০টা ২৩ মিনিটে হিউসটন থেকে নির্দেশ গেল, কাজকর্ম বন্ধ রেখে ভেলায় ঢুকে পড়। বিপদ এসে যাচ্ছে। কাজকর্ম অসমাপ্ত রেখেই আলড্রিন ভেলায় গিয়ে উঠলেন। আলড্রিন প্রায় ১ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়ান। এর কিছুক্ষণ পরে অধিনায়ক আর্মস্ট্রংও তাঁকে অনুসরণ করলেন। ঘড়িতে তখন ভারতীয় সময় ১১টা ২১ মিনিট। আর্মস্ট্রং প্রায় ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়িয়েছেন।

ভেলার ঢাকনা বন্ধ হয়ে গেল। ভেলায় উঠে দু'জনে মিলে আহারে বসলেন। আহার শেষে নিদ্রা।

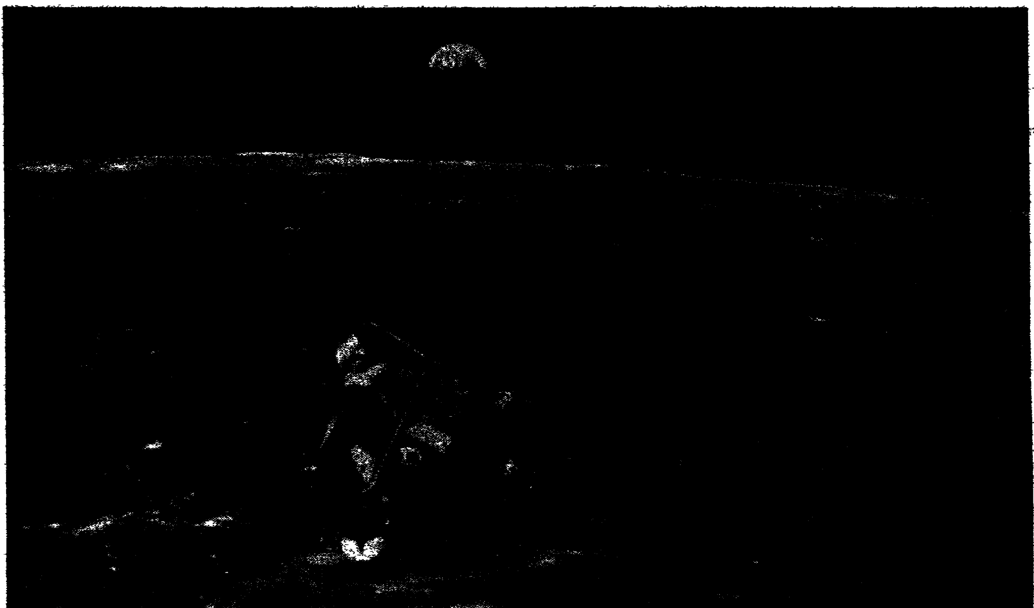
পরে হিউসটন থেকে জানানো হয়েছে, আর্মস্ট্রং চাঁদ থেকে যে ২৭ কিলোগ্রাম ধূলোবালি ও পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন, বিজ্ঞানের দিক থেকে তা অমূল্য বলেই মনে হচ্ছে। ছোট একটু জায়গায় এত বিচিত্র ধরনের পাথর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, বিশেষজ্ঞরা তা স্বপ্নেও ভাবেননি। আর্মস্ট্রং নিজে একজন ভূতত্ত্ববিদ্। তিনি জানিয়েছেন, কিছু পাথরে অভ্রের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিছু পাথরে রয়েছে ব্যাসল্ট—যেটা আদিকালে লাভার অস্তিত্ব প্রমাণ করছে। একটি পাথরে বায়োটাইট আছে বলে মনে হচ্ছে। বিজ্ঞানের দিক থেকে এটা অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ এতে সাধারণতঃ শতকরা ২ থেকে ৪ ভাগ জল থাকে। আর্মস্ট্রং তিন ইঞ্চি গভীরতা থেকে স্যাঁতসেঁতে মাটি তুলেছেন। তবে কি সেখানে জল আছে? এবং সম্ভবত জীবনও? বিজ্ঞানীদের আশা, এইসব পাথর পরীক্ষা ক'রে তাঁরা শুধু চাঁদ ও পৃথিবীরই নয়, সমগ্র সৌর-জগতের সৃষ্টি-রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন।

চাঁদে বেড়ানো শেষ, এখন ঘরে ফেরার পালা। ভারতীয় সময় রাত্রি ১১টা ২৪ মিনিটে আমেরিকার দুই মহাকাশচারী তাঁদের



চিত্র ৫৫। চাঁদের শান্ত-সাগর এলাকায় এক ধু-ধু বিরস প্রান্তরে একলা দাঁড়িয়ে আছেন এড্উই আল্‌ড্রিন—ফটো তুলেছেন নীল আর্মস্ট্রং। মহাকাশচারীর হেল্‌মেট-এর কাচের আবরণে মার্কি পতাকা, টেলিভিশন ক্যামেরা, নীল আর্মস্ট্রং এবং চন্দ্রযানের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে।

[ইউ. এস. আই. এস.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত



চিত্র ৫৬। চাঁদের মাটি থেকে 'ঈগল'-এর উঠে আসার দৃশ্য। নীচে চাঁদের জমি, আর দূরে আকাশে পৃথিবী। ফটো তুলেছেন মাইকেল কলিন্‌স।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

চন্দ্রযান ঈগল-এর রকেট-ইঞ্জিন চালু ক'রে চাঁদের বুক ছেড়ে ধূসর আকাশে পরিক্রমারত নিঃসঙ্গ সতীর্থের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ভেলার আরোহণ-পর্যায় এমন নিখুঁতভাবে চাঁদের আকাশে উঠে গেল যে, অধিনায়ক আর্মস্ট্রং আনন্দে আত্মহারা হয়ে চীৎকার ক'রে বললেন,—আহা, কী সুন্দর!

এদিকে অ্যাপোলো-১১-এর তৃতীয় যাত্রী মাইকেল কলিন্‌স মূল মহাকাশযান 'কলম্বিয়া'-তে ক'রে প্রায় ৭০ মাইল ওপরে একটি কক্ষপথে ক্রমাগত ঘুরে চলেছেন।

পৃথিবীতে ফিরে এসে তিনি বলেছেন,—"যে-সব দৃশ্য মানুষের চোখে দেখার সৌভাগ্য কদাচিৎ হয়, এরূপ অনেক দৃশ্য আমি দেখেছি। কিন্তু এসবের মধ্যেও সবচেয়ে বিস্ময়কর হ'ল, চাঁদের মাটি থেকে 'ঈগল'-এর উঠে আসার দৃশ্য।

আমি তখন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। কারণ, তখনই আমি সর্বপ্রথম বুঝতে পারলাম যে, ওঁরা সাফল্যের সঙ্গে চাঁদে নেমেছেন এবং আবার উঠে এসেছেন। চাঁদের দিনটি ছিল চমৎকার, পরিষ্কার আর ঝরঝরে। চাঁদকে একটা ভয়াবহ নিষিদ্ধ জায়গা বলে একটুও মনে হচ্ছিল না, যেমনটি মনে হয় সূর্য দিগন্তের কাছাকাছি থাকলে। সূর্য অনেকটা উঁচুতে থাকায়, একে একটি সুন্দর জায়গা ব'লে মনে হচ্ছিল। সমগ্র অবস্থাটাই ছিল খুবই আনন্দের, কারণ 'চাঁদের ভেলা' ক্রমশ বড় থেকে আরও বড় দেখাচ্ছিল, ক্রমশ আরও উজ্জ্বল এবং আরও চকচকে। যখন যেখানে তার থাকা উচিত, ঠিক সেইখানে।"

চাঁদের ভেলাটি ধীরে ধীরে কলম্বিয়ার দিকে এগিয়ে এল। এর পরে দু'টি যানেরই সমস্ত কলকব্জা পরীক্ষা ক'রে দেখা হ'ল। তারপর কলম্বিয়া সামনের দিকে এগিয়ে এলো এবং তার নাকটা গলিয়ে দিল ঈগল-এর একটি ফোঁকরের মধ্যে। এই ভাবেই চাঁদের আকাশে দু'জনের মিলন হ'ল।

কলম্বিয়ার সঙ্গে ঈগল-এর পুনঃসংযোজনের সময় (ডকিং) 'ঈগল' কিছুটা এধার-ওধার ক'রে সরে যায়। ফলে সংযোজন প্রায় তিন মিনিট দেরি হয়। এই মিলন যখন সম্পূর্ণ হ'ল, তখন ভারতীয় সময় সোমবার (ইংরাজীমতে মঙ্গলবার) রাত্রি ৬টা ৫ মিনিট।

এবার চন্দ্র-বিজয়ী দু'জন নভশ্চর তাঁদের অমূল্য সম্পদসহ কলম্বিয়ায় চলে এলেন। চন্দ্রযান ঈগল মহাকাশে পরিত্যক্ত হ'ল।

অ্যাপোলো-১১ চাঁদের ওপিঠে অদৃশ্য হয়ে আবার যথাসময়ে এদিকে ফিরে এল। পৃথিবী থেকে জিজ্ঞেস করা হ'ল,—"ফেরবার পর্বের রকেটটি ঠিকমতো জ্বালানো হয়েছে তো ?" আর্মস্ট্রং উত্তর দিলেন,—"পৃথিবীতে ফেরার পর আমাদের তুলে নেওয়ার জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন।"

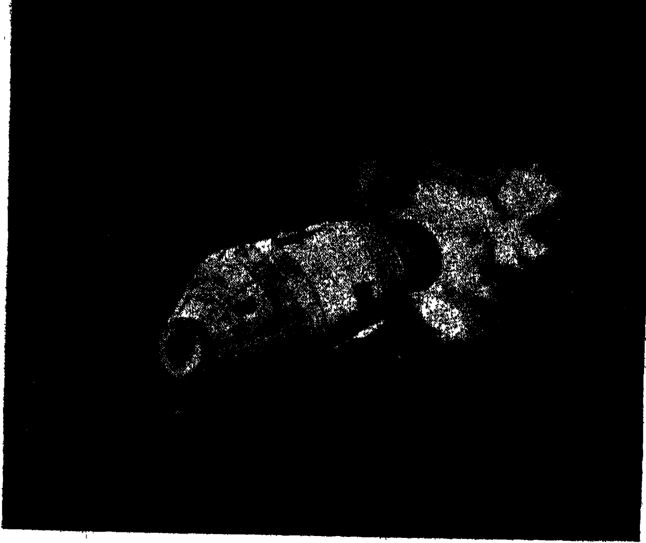
মূল ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ ঘটানোর দরুন অ্যাপোলোর গতিবেগ ঘণ্টায় ৩,৪৭৮ মাইল (৫,৬০০ কি. মি.) থেকে বেড়ে ৫,৬৫২ মাইলে (৯,১০০ কি. মি.) উঠলো। এই গতিবেগ মহাকাশযানকে চাঁদের অভিকর্ষ থেকে বের করে আনার পক্ষে যথেষ্ট। নভশ্চরদের নিয়ে অ্যাপোলো-১১ মর্ত্যের দিকে পাড়ি জমালো।

ক্লান্ত অভিযাত্রীরা এরই মধ্যে ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। গৃহগতপ্রাণ নাবিকের মতোই আর্মস্ট্রং বললেন, —"যেখানেই যাও না কেন, ঘরে ফেরার চেয়ে ভালো আর কিছুই নেই।"

ঘরের কথা ভাবতে ভাবতে মহাকাশচারীরা এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। কী গভীর, কী দীর্ঘ, কী নিশ্চিন্তের সেই ঘুম !

২২শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত ১১টা ২৩ মিনিটে অ্যাপোলো-১১ সেই কাল্পনিক জায়গাটি পার হয়ে এলো, যেখানে চাঁদ ও পৃথিবীর অভিকর্ষ সমান সমান। সম-অভিকর্ষ এলাকা অতিক্রম করার পর থেকেই, পৃথিবীর আকর্ষণে, অ্যাপোলোর গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

২৩শে জুলাই, ভারতীয় সময় রাত ৪টা ১১ মিনিটে অ্যাপোলো চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝপথ অতিক্রম ক'রল। তখনও সে পৃথিবী



চিত্র ৫৭

রকেট-ইঞ্জিন চালিয়ে অ্যাপোলো চাঁদের কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু হ'ল পৃথিবীর দিকে।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

থেকে প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার মাইল দূরে ছিল ও তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৩,৩৫৪ মাইল। অ্যাপোলো দুর্বার গতিতে ছুটে চললেও তার অভ্যন্তরে তিনজন অভিযাত্রীই তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

২৪শে জুলাই, পৃথিবী ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পথটি যদি অত্যধিক খাড়া হয়, তবে বায়ুকণার সংঘর্ষে আগুন জ্বলে উঠবে এবং একটি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মতো মহাকাশযানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আবার পথটি

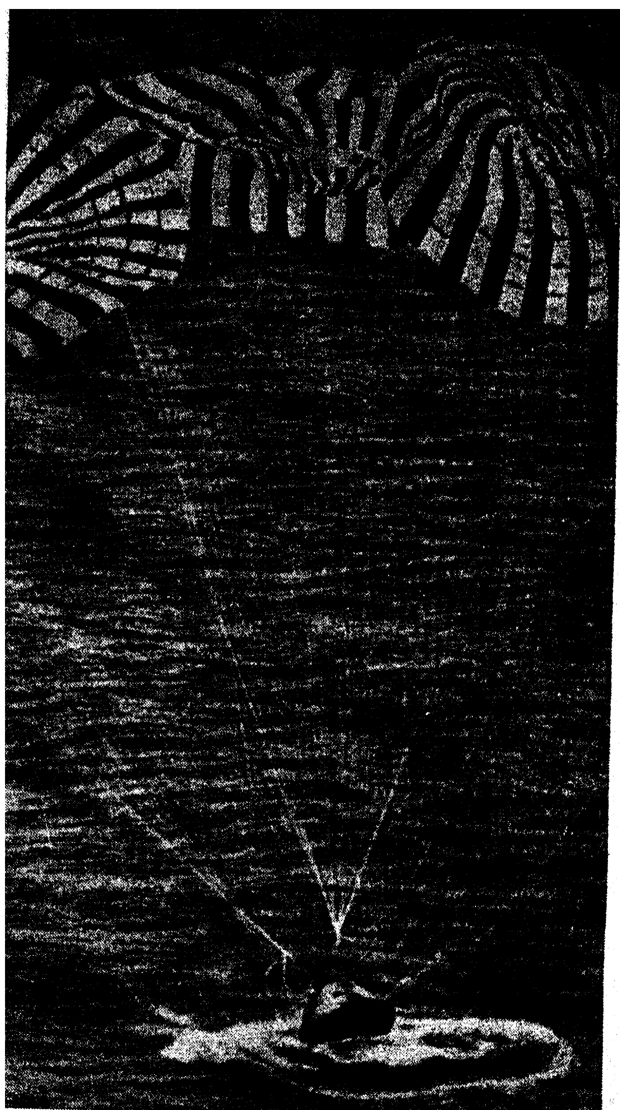
যদি বেশী কাত হয়, তবে মহাকাশযানটি নামতেই পারবে না, ছিটকে উপরে উঠে যাবে। অতএব প্রায় ৪ লক্ষ ফুট উপরে থাকতেই একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরে তাঁদের প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে নামবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'ল। তখন ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৭ মিনিট।

রাত্রি ৯টা ৫০ মিনিট—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পূর্বক্ষণে প্রধান রকেটটি-সহ সারভিস মডুলটি বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হ'ল। বায়ুকণার সংঘর্ষে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে মিশে গেল। রাত্রি ১০টা ৫ মিনিটে ক্যাপ্‌সুলটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ ক'রে একটি আগুনের গোলা বা জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মতো হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে বেতার সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দেখা গেল, একটি আগুনের গোলা উর্ধ্বাকাশ থেকে তির্যক গতিতে মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে নেমে আসছে। এই সময় ক্যাপ্‌সুলটির চেপ্টা দিকটা ছিল নীচের দিকে এবং তার আবরণের তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০° সেন্টিগ্রেডে উঠেছিল—কিন্তু সেজন্য মহাকাশচারীদের একটুও অসুবিধা হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই, ভারতীয় সময় রাত ১০টা ১৬ মিনিটে, পৃথিবীর সঙ্গে আবার বেতার সংযোগ স্থাপিত হ'ল। জানা গেল, ওই আগুনের গোলার মধ্যে বসে থাকা তিন চন্দ্রচারী নিরাপদেই আছেন।

এর তিন মিনিট পরেই, অর্থাৎ ভারতীয় সময় রাত ১০টা ১৯ মিনিটে, ক্যাপ্‌সুলটি প্যারাসুটে ভর ক'রে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে নেমে এলো। উদ্ধারকারী জাহাজ নিকটেই ছিল। তা থেকে হেলিকপ্‌টারগুলি দ্রুতগতিতে ছুটে গেল ক্যাপ্‌সুলটির দিকে।

কিন্তু লক্ষ্য করে দেখা গেল, ক্যাপ্‌সুলটি জলে ভাসছে উল্টো-ভাবে, মানে ওর মাথাটি নীচের দিকে এবং নিম্নভাগ ওপরের দিকে। কেন এরকম হ'ল তা সঠিক জানা যায়নি। আট দিনের এই দুঃসাহসিক অভিযানে এইটিই একমাত্র ত্রুটি বলা যায়।



চিত্র ৫৮। অভিযানের শেষ পর্বে মাত্র ছ'টন ওজনের ক্যাপ্সুলটি প্যারাশুটে ভর ক'রে ধীরে ধীরে নেমে এল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। ক্যাপ্সুলটি দেখতে একটি শঙ্কুর মতো (conical), এর তলার দিকের ব্যাস মাত্র ১৩ ফুট এবং উচ্চতা মাত্র ১১ ফুট।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

ক্যাপ্‌সুলটি উল্‌টে পড়ায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কয়েক মিনিট দেরি হ'ল। মহাকাশযানটি সোজা করতে প্রায় ছ'মিনিট সময় লাগলো। উদ্ধারকারী ফ্রগম্যানদের একজন তখন ক্যাপ্‌সুলের অভ্যন্তরে টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করলেন। অভিযাত্রীরা জানালেন যে তাঁরা বেশ ভাল আছেন। চাঁদ থেকে তাঁরা যে অমূল্য পাথর ও মাটি সংগ্রহ ক'রে এনেছেন তা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত আছে।

সমুদ্রে ভেসে থাকা অবস্থায় ক্যাপ্‌সুলের ঢাকনা খুলে একজন উদ্ধারকারী ফ্রগম্যান অভিযাত্রীদের হাতে 'কোয়ারেন্‌টাইন পোশাক' দিয়ে দিলেন। উদ্ধারকারী নিজেও এই পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। সর্ব-অঙ্গ আবরণকারী এই পোশাকের উপরদিকে রয়েছে শিরস্ত্রাণ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য আছে গ্যাস-মুখোস। এর কারণ, তিনজন অভিযাত্রীকে অন্ততঃ ১৮ দিন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা কোয়ারেন্‌টাইন ক'রে রাখতে হবে। তারপর ১১ই আগস্ট তারিখে চিকিৎসকরা তাঁদের পরীক্ষা করে দেখবেন, চাঁদের মাটি থেকে এমন কোন রোগ তাঁরা বহন করে এনেছেন কিনা যা পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা বার বার বলেছেন যে, চাঁদ প্রাণহীন, কোনো জীবনের চিহ্নও সেই মৃত উপগ্রহে নেই। তবুও এ ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

এইভাবে চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন এঁকে রেখে এসে তাঁদের ৮-দিনের মহাকাশ-যাত্রা শেষ হ'ল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও অন্যরা বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ 'হরনেট'-এ উপস্থিত থেকে তাঁদের স্বাগত জানালেন, কিন্তু করমর্দন করতে তাঁরা পারলেন না। তাঁরা চন্দ্রলোক থেকে হয়তো অদৃশ্য জীবাণু বয়ে এনেছেন, তাই এত সাবধানতা।

পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হ'ল যে, মহাকাশচারীরা কোনরূপ জীবাণু বহন ক'রে আনেন নি। তাই নির্দিষ্ট সময় পরে তাঁরা

কোয়ারেন্টাইন থেকে বেরিয়ে এলেন। আত্মীয়-স্বজন এবং জনসাধারণের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করার অনুমতিও তাঁরা পেলেন।

এইভাবে মানব-ইতিহাসের সর্বাধিক রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটলো। এ শুধু তিনটি মানুষের চন্দ্রাভিযান নয়, এটা আরও অনেক বড় জিনিস। অজানাকে জানবার যে অদম্য ও অতৃপ্ত পিপাসা সমগ্র মানবজাতির রয়েছে, এ অভিযান তারই প্রতীক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চাঁদের পাথর ও মাটি

অ্যাপোলো-১১ অভিযান শেষে তিনটি মানব সন্তান চাঁদমামার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন এক অমূল্য সম্পদ—চাঁদের শান্ত-সাগর এলাকা থেকে কুড়িয়ে আনা প্রায় ২৭ কিলোগ্রাম ওজনের ধূলোমাটি ও পাথরের নুড়ি। এদের গঠন এবং রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন বিজ্ঞানীদের তেমনি সাধারণ মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই।

এই অভিযানে চাঁদের পাথর ও মাটির যেসব নমুনা সংগ্রহ ক'রে আনা হয়েছে, তাদের প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) বুদ্‌বুদযুক্ত সূক্ষ্ম আগ্নেয়শিলার কণা, (২) আগ্নেয়শিলার মাঝারি আকারের কেলাস (Crystal), এবং (৩) নানা ধরনের মিশ্র প্রস্তর-চূর্ণ বা চাঁদের ধূলোমাটি। হাল্‌কা ধূসর থেকে গাঢ় ধূসর এদের রঙ।

বিজ্ঞানীদের মতে, প্রথম ধরনের পাথরগুলির সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয়গিরি থেকে উৎসারিত গলিত লাভা এবং গ্যাসের বুদ্‌বুদ একসঙ্গে জমে যাওয়ার ফলে। এরূপ পাথরের এক-একটি কেলাসের ব্যাস এক থেকে তিন মিলিমিটার। মাঝারি আকারের পাথর-গুলিরও উৎস আগ্নেয়গিরি। আর মিশ্র প্রস্তরচূর্ণের প্রায় অর্ধেকটাই হ'ল কাচ-জাতীয় পদার্থ। এই কাচ অবশ্য ঠিক পৃথিবীতে প্রাপ্ত কাচের মতো নয়। এগুলি হ'ল খুব ছোট ছোট চক্‌চকে গোলাকার কাচ-কণার সমষ্টি।

চান্দ্র শিলা বিশ্লেষণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন চান্দ্র গবেষণাগারের চারজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। এঁরা হলেন নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অলিভার শেফার ও ডঃ জন ফান্কহাউসার, পশ্চিম জার্মেনীর হাইডেলবার্গে অবস্থিত ম্যাক্স

প্ল্যান্‌ক ইন্‌স্টিটিউটের ডঃ জোসেফ জারিজার এবং হিউস্টনের মহাকাশঘাঁটির ডঃ ডোনাল্ড বোগার্ট।

এঁরা বলেছেন, সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল যতদিন আগে, চাঁদের বয়সও ততদিন। অনুমান করা হয়েছে যে, চাঁদ সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে। সৌরজগতেরও সৃষ্টি প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে হয়েছে বলেই অনুমান করা হয়। এই সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তাহলে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ যখন প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত চাঁদের পৃষ্ঠদেশ সম্ভবতঃ অবিকৃত রয়ে গেছে। এই আবিষ্কার চন্দ্রতত্ত্ববিশারদ নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী ডঃ হ্যারল্ড ইউরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেশ মিলে গেছে। বিগত কয়েক দশক ধরেই ডঃ ইউরে ব'লে আসছেন যে, চাঁদের যখন জন্ম হয়েছিল, তখন এর পৃষ্ঠদেশ যেমন ছিল, এখনও অনেকটা সেই রকমই আছে।

বিজ্ঞানীরা 'স্পেক্‌ট্রোমিটার' নামক যন্ত্রের সাহায্যে চান্দ্র শিলার নমুনাগুলি পরীক্ষা করেছেন। এর সাহায্যে প্রস্তরখণ্ডের নমুনা পরীক্ষা করলে জানা যায়, তা কোন্ কোন্ রাসায়নিক মৌল দ্বারা গঠিত।

এঁরা বলেন, চান্দ্র শিলায় আর্গন জাতীয় দুষ্প্রাপ্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস প্রভূত পরিমাণে পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ভূ-ত্বকে প্রাচীনতম শিলাগুলি যত প্রাচীন, চান্দ্র শিলাও তত প্রাচীন, এবং শেষোক্তগুলি ৪৫০ কোটি বছরের প্রাচীন হ'তে পারে। আজ অবধি এই পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন যেসব শিলা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের বয়স প্রায় ৩৩০ কোটি বছর। কিন্তু সেগুলি ভূ-পৃষ্ঠের অনেক নীচে প্রোথিত রয়েছে, আর বাইরের বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসেনি ব'লে প্রায় অবিকৃত রয়েছে।

অবশ্য এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত হবে না যে,

চাঁদের বয়স পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী। এখানে মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর প্রথম একশ' কোটি বছরের কোন ইতিহাসই খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ, সেই আদিযুগে, পৃথিবীর প্রথম শৈশবে, আগ্নেয়গিরির তৎপরতা, উল্কাপাত, বায়ুপ্রবাহ, বর্ষণ প্রভৃতি মিলে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ ধুয়েমুছে ফেলেছে।

সাধারণতঃ আর্গন-৪০ গ্যাসের সঙ্গে পটাসিয়ামের অনুপাত হিসেব ক'রে শিলার বয়স নির্ণয় করা হয়। পটাসিয়াম-৪০ নামক তেজস্ক্রিয় মৌলটি কালক্রমে আর্গন-৪০ নামক মৌলে রূপান্তরিত হয়। কাজেই কোনও পদার্থের মধ্যে যদি খুব সামান্য পরিমাণ আর্গন-৪০ থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে পদার্থটি নবীন। আর নমুনার মধ্যে যদি আর্গন-৪০ প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে পদার্থটি খুব প্রাচীন।

চান্দ্র শিলার যেসব নমুনা পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে, তাতে প্রচুর পরিমাণ আর্গনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এতে ঐ নমুনাগুলির প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। সূর্য থেকে নিয়মিতভাবে অসংখ্য পরমাণু-কণা বিকিরিত হচ্ছে, এবং চন্দ্রে কোনও আবহমণ্ডল না থাকায়, এদের মধ্যে অনেকগুলি সোজাসুজি এসে অনাবৃত চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত করছে। এর নাম 'সোলার উইণ্ড' বা সৌর বাত্যা। আর্গন-৪০ হ'ল এই সৌর বাত্যারও উপজাত পদার্থ। চান্দ্র শিলায় প্রাপ্ত আর্গন-৪০ কতখানি সোজাসুজি সূর্য থেকে এসেছে, আর কতখানি আদিম পটাসিয়ামের রূপান্তরের ফলে সৃষ্ট হয়েছে, তা আমাদের জানা নেই। এজন্য মহাকাশচারীরা চাঁদের বুকে একটি যন্ত্র রেখে এসেছেন, এরই সাহায্যে সৌর বাত্যার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তবে এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত আজও জানা যায়নি।

শান্ত-সাগরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে চান্দ্র শিলার যে ২৩টি নমুনা সংগ্রহ ক'রে আনা হয়েছে, সেগুলি পরীক্ষা ক'রে

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে, এদের রাসায়নিক গঠনে একটা মূল ঐক্য আছে। কিন্তু এদের কারও গঠন হুবহু পার্থিব কোনও শিলার মতো নয়। এ থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে, পৃথিবীর শৈশবে তার দেহ থেকে কিছু অংশ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে তারপর জমাট বেঁধে চাঁদের সৃষ্টি করেছিল, এই মতবাদ একেবারেই অসম্ভব। কাজেই হয় পৃথিবী ও চাঁদ প্রায় একই সময়ে প্রায় একই রকম উপাদান দিয়ে আলাদা ভাবে সৃষ্ট হয়েছিল, নয়তো সুদূর অতীতে চাঁদ মহাকাশের অন্য কোনও এলাকায় সৃষ্ট হয়েছিল এবং সেখান থেকে ভেসে এসে দৈবাৎ পৃথিবীর মহাকর্ষের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। আর সম্ভবত সেই থেকেই চাঁদ পৃথিবীরই একটা উপগ্রহে পরিণত হয়ে অবিরাম তারই চারিদিকে ঘুরে চলেছে।

চাঁদের শান্ত-সাগর এলাকা থেকে সংগৃহীত পাথরকুচির কোন-কোনটি যে প্রায় সাড়ে তিন শ' কোটি বছর সেখানে কাটিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেকেই মনে করেন যে, ভবিষ্যতে যেসব অভিযান চালানো হবে, তার ফলে হয়তো এর চেয়েও প্রাচীন পাথরের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভবিষ্যৎ অভিযানগুলির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

চান্দ্র শিলার অনেকগুলিই আগ্নেয়শিলার মতো (Igneous) —অর্থাৎ হয় অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, নয়তো উল্কার আঘাতের ফলে, এগুলি একসময় গলিত অবস্থায় ছিল। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সুদূর অতীতে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ, যেমন—অগ্ন্যুৎপাত অথবা উল্কার আঘাত, চন্দ্রপৃষ্ঠ গঠনে একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পাথরকুচির প্রতিটি নমুনার মধ্যে কাচ-জাতীয় জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এজন্য এখন অনেকেই অনুমান করেন যে, চাঁদের বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবী থেকে অনেকাংশে আলাদা।

চান্দ্র শিলার নমুনাগুলি পরীক্ষা ক'রে এটা স্পষ্ট বোঝা গেছে

যে, এগুলি মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক গড়াগড়ি খেয়েছে এবং কখন কখনও একেবারে উল্‌টেও গেছে। কারণ, পাথরের চারদিকেই (শুধু উপরদিকে নয়) উল্কা-কণার আঘাত-জনিত ছোট ছোট গর্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। চন্দ্রপৃষ্ঠেও যে পাথরের ক্ষয় হয়, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে, কারণ অধিকাংশ পাথরই বেশ গোলাকার এবং অমসৃণ। মনে হয়, এরূপ ক্ষয়, যদিও তা পৃথিবীর তুলনায় অনেক ধীরে ধীরে হয়েছে, সৌর বাত্যার অথবা খুব ছোট ছোট উল্কা-কণার আঘাতের ফলে অথবা চন্দ্রপৃষ্ঠে বারবার গড়িয়ে যাওয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

পার্থিব এবং চান্দ্র শিলার রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হ'ল এই যে, চান্দ্র শিলায় ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম, ইট্রিয়াম, জিরকোনিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি মৌলের পরিমাণ কল্পনাতীতরূপে বেশী। এদের সকলেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল অতি উচ্চ গলনাঙ্ক, যদিও মিশ্রণ হ'লে তার গলনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত কম হ'তে পারে। পার্থিব শিলায় যে পরিমাণ ক্রোমিয়াম পাওয়া গেছে, তার প্রায় দশগুণ পাওয়া গেছে চান্দ্র শিলায়। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে সংগৃহীত কেলাসিত আগ্নেয়শিলায় শতকরা ১২ ভাগ টাইটেনিয়াম অক্সাইড পাওয়া গেছে, যেখানে আজ অবধি পার্থিব কোন শিলায়ই শতকরা ৪·৫ ভাগের বেশী পাওয়া যায়নি। আর সোনা ও রূপার মতো মূল্যবান্ ধাতুর পরিমাণ খুবই কম। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এডওয়ার্ড অ্যান্‌ডার্স-এর হিসেব অনুযায়ী ৪,৫০০ কিলোগ্রাম চাঁদের মাটি থেকে প্রায় এক আউন্স (প্রায় ২৮ গ্রাম) পরিমাণ সোনা পাওয়া যেতে পারে। এদিকে পার্থিব শিলায় লেড, বিস্‌মাথ, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি নিম্ন গলনাঙ্ক-বিশিষ্ট মৌলগুলির প্রাচুর্ভাব পরিলক্ষিত হলেও চান্দ্র শিলায় এদের দুষ্প্রাপ্যতা বিজ্ঞানীদের রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে।

১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে দু'জন জাপানী ভূ-তত্ত্ববিদ্,

ডঃ ইকুয়ো কুশিরো এবং টাকেশী নাগাতা, হিউস্টনে অবস্থিত মহাকাশ-গবেষণাকেন্দ্রে তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। এঁরা চান্দ্র শিলায় 'অ্যাপেটাইট' ও 'ট্রলাইট' নামক দুই প্রকার দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, 'ট্রলাইট' শুধুমাত্র উল্কাপিণ্ডেই পাওয়া গেছে, পার্থিব শিলায় এর অস্তিত্ব আজও প্রমাণিত হয়নি। এও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

মহাকাশচারীরা চাঁদের বুকে একটি 'সিস্‌মোগ্রাফ' যন্ত্র রেখে এসেছেন। এই যন্ত্র থেকে প্রেরিত চন্দ্রকম্পন বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন নিউ ইয়র্কে অবস্থিত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন বিজ্ঞানী, ডঃ গ্যারি ল্যাথাম ও ডঃ মরিস ইউইং। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের কম্পনের সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠের কম্পনের বেশ পার্থক্য আছে। আর চাঁদের অভ্যন্তরভাগের অবস্থা কখনই ভূ-ত্বকের নিম্নভাগের মতো নয়।

আমরা জানি, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। ভূ-ত্বক্ প্রায় চল্লিশ মাইল গভীর, এর উপাদান প্রধানত দু'রকম পাথর—গ্র্যানাইট ও ব্যাসল্ট। এর নীচে প্রায় আঠারশ' মাইল গভীর পর্যন্ত স্তরটি লোহা ও সিলিকায় ভর্তি। এই স্তর অনেকটা পিচের মতো অবস্থায় আছে, আঘাত করলে কঠিন পদার্থের মতো মনে হয়, কিন্তু খুব বেশী চাপ দিলে নরম পদার্থের মতো বসে যায়। এরও নীচে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় দু'হাজার মাইল প্রচণ্ড উত্তপ্ত তরল লোহা ও নিকেল দিয়ে তৈরী। এজন্য যত নীচের দিকে যাওয়া যায় উষ্ণতা তত বেশী হয়।

চন্দ্রের অভ্যন্তরভাগ থেকে আগত কম্পন অনেক বিক্ষিপ্ত ও ক্ষীণ। তাই দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, চন্দ্রদেহে হয়তো কম্পনের বড় রকমের কোনও উৎস নেই। অথবা চন্দ্রদেহের বিভিন্ন অংশ হয়তো বিভিন্ন রকম পদার্থ দিয়ে তৈরী, তাই হয়তো

কম্পনের কিয়দংশ শোষিত হয়ে যায়। তাঁদের ধারণা, সুদূর অতীতে বড় বড় উল্কার আঘাতে চন্দ্রপৃষ্ঠে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে, আর সেইজন্যই হয়তো কম্পনের গতি-প্রকৃতি এইরূপ। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, চাঁদের অভ্যন্তরভাগ কখনই পৃথিবীর মতো নয়। এর শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ হয়তো ব্যাসল্ট জাতীয় উপাদানে গঠিত। আর কেন্দ্র পর্যন্ত এর অভ্যন্তরভাগ বেশ শীতল এবং কঠিন, আর বড় বড় ফাটলে ভরা।

এছাড়া চাঁদের চৌম্বক ক্ষেত্র, তড়িৎ-পরিবাহিতা প্রভৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চাঁদের অভ্যন্তরভাগের উষ্ণতা খুব বেশী হ'লে ৮০০ থেকে ১০০০° সে. পর্যন্ত হ'তে পারে (পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের উষ্ণতা এর কয়েক হাজার গুণ বেশী)। এজন্য অনেকের অনুমান, চাঁদের অভ্যন্তরভাগ কখনও সম্পূর্ণ গলিত অবস্থায় ছিল না। চাঁদের অভ্যন্তর পেঁয়াজের মতো স্তরে স্তরে বিন্যস্ত কিনা, তা এখনও জানা যায়নি। সে সম্পর্কে কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হ'লে তার জন্য আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার।

এই প্রসঙ্গে আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, চাঁদের মাটির কোনও নমুনাতেই আজ অবধি এক ফোঁটা জলেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি, যদিও পৃথিবীর সবচেয়ে শুষ্ক পাথরের মধ্যেও জলের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়।

চাঁদে জলও নেই বায়ুও নেই, সুতরাং সেখানে কোনরূপ জীব থাকাও সম্ভব নয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় চাঁদের পাথরে বা মাটিতে জীবনের (অতীত বা বর্তমান) কোনও প্রমাণও পাওয়া যায়নি। মহাকাশচারীরা চাঁদ থেকে যে-সব পাথর ও মাটির নমুনা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন, সেগুলি পরীক্ষা ক'রে কোন প্রকার জীবাণুরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি কোন প্রকার জীবাশ্ম (Fossil), যা থেকে মনে করা যাবে যে, চাঁদের বুকে এককালে প্রাণের সাড়া

ছিল। তাই বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে, চাঁদে কোন রকম জীব থাকা সম্ভব নয়, অন্ততঃ আমরা যেরকম জীবন দেখতে অভ্যস্ত সেরকম তো নয়ই। বলা বাহুল্য, মহাকাশচারীরা চাঁদের বুকে বিচরণ করার সময় সেরকম কিছু দেখতেও পাননি।

তবে একটি খবরে প্রকাশ যে, হিউস্টনের চান্দ্র গবেষণাগারে চাঁদের মাটি মেশানো পৃথিবীর মাটিতে উদ্ভিদ্ বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছে। এরূপ মাটিতে লাগানো প্রায় চার হাজার গাছ পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখা গেছে যে, এঁদের প্রত্যেকটি প্রায় সমানভাবে বাড়ছে। তাছাড়া এইসব গাছ অন্যদের তুলনায় অনেক বড় এবং অনেক বেশী সবুজ হয়েছে। এ থেকে মনে হয় যে, চাঁদের মাটিতে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা গাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সুতরাং আবহাওয়া অনুকূল থাকলে, অর্থাৎ জল ও বায়ুর সরবরাহ অক্ষুন্ন থাকলে, চাঁদের মাটিতে চাষ-আবাদ নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। আজ পর্যন্ত যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তাতে মনে হয় যে, চাঁদের মাটি পৃথিবীর গাছপালা বা প্রাণীর উপর খারাপ কোনও প্রভাব বিস্তার করবে না। এসবের উপর চান্দ্র শিলার কোনও সূক্ষ্ম এবং সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে কিনা তাও পরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে। তবে সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানতে আরও কয়েক বছর কেটে যাবে।

এই প্রসঙ্গে সবশেষে এইটুকু বলা দরকার যে, চাঁদের পাথর ও মাটি পরীক্ষা ক'রে আজ অবধি যত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সৌর জগতের সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটনকল্পে আমাদের হয়তো আরও অনেক অভিযান এবং তাদের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে।

নবম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

মহাকাশ-বিজয়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে। এজন্য এই দু'দেশেই হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে অকাতরে। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব যখন শেষ হ'ল, বরমাল্য তখন রাশিয়ার গলে।

এরপর আরম্ভ হ'ল দ্বিতীয় পর্ব। অর্থাৎ কে আগে চাঁদে নামবে, তারই প্রতিযোগিতা। গোড়ার দিকে রাশিয়াই পুরোভাগে ছিল, কিন্তু আমেরিকা ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে সোভিয়েত কৃতিত্বের রেকর্ড অতিক্রম ক'রে গেছে। মার্কিন মহাকাশচারীরা এরই মধ্যে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেছেন, চাঁদের ভেলায় ক'রে চাঁদের দশ মাইলের মধ্যে নেমে গেছেন, তারপর নির্বিঘ্নে অবতরণ করেছেন চন্দ্রপৃষ্ঠে এবং প্রতিবারই নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন জননী পৃথিবীর কোলে। মানুষের সুদীর্ঘকালের স্বপ্ন এতদিনে সফল হ'ল, পৃথিবীর মানুষ চাঁদের মাটিতে পা দিল। আর এই অক্ষয় কৃতিত্বের অধিকারী হলেন মার্কিন মহাকাশচারীরা। কাজেই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্ব যখন শেষ হ'ল, বরমাল্য তখন আমেরিকার গলে।

আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে, চাঁদে যাওয়ার এক কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছিলেন প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক জুল ভার্ন। ১৮৬৫ সালে তাঁর 'পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে' নামক বইখানা বেরুলো। আজকের অবস্থার সঙ্গে এর যে কী অদ্ভুত মিল রয়েছে, তা ভেবে অবাক হ'তে হয়।

জুল ভার্ন এই অভিযানের কৃতিত্ব দিয়েছিলেন আমেরিকানদের, আর অভিযান শুরু হয়েছিল আমেরিকার ফ্লোরিডা প্রদেশ থেকে।

গান ক্লাবের সদস্যরা এক জায়গায় মিলিত হয়েছেন। তাঁদের সামনে এক গুরুতর সমস্যা। যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয়ে গেছে, পৃথিবীর

মানুষ সব শান্তির জন্ত ক্ষেপে গেছে। কামান, গোলাগুলির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তারা তো সবাই বেকার হয়ে যাবেন। এখন উপায়! কি ক'রে আবার একটা যুদ্ধ বাধানো যায় এই নিয়ে কেউ কেউ শলাপরামর্শ করতে লাগলো, আবার কেউ কেউ তাদের শান্তিকামী প্রেসিডেন্টকে গালাগালি দিতে লাগলো।

এই সময়, ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বারবিকেন হঠাৎ একটা চমকপ্রদ পরিকল্পনা পেশ করলেন। তিনি বললেন,—যুদ্ধ থেমে গেছে ব'লে কি আমরা চুপ ক'রে বসে থাকবো? আমরা এমন কিছু করবো, যাতে পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে।

চাঁদের দূরত্ব, গতি, গঠন—এ সবই আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু এ পর্যন্ত চন্দ্রলোকে যাবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। আপনারা হয়তো ভাবছেন যে, এ একেবারে অসম্ভব। কিন্তু তা নয়। আমরা যদি কামানের সেরকম উন্নতি করতে পারি, তাহ'লে কামানের একটা গোলা নিশ্চয়ই চাঁদে পাঠানো যেতে পারে। চাঁদের দূরত্ব কতই বা, মাত্র আড়াই লক্ষ মাইল। আমি হিসেব ক'রে দেখেছি, সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ বেগে চলবে—এমন একটা গোলা যদি ছোঁড়া যায়, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই চাঁদে পৌঁছাবে। এই কাজটা নিশ্চয়ই কঠিন হবে না। আপনারা সবাই উঠে-পড়ে লাগুন।

সঙ্গে সঙ্গে এরূপ একটি কামান এবং গোলা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল। সেই সঙ্গে শুরু হ'ল জল্পনা-কল্পনা ও বাক-বিতণ্ডা। চাঁদে গোলা পাঠাবার আলোচনায় সারা আমেরিকা মত্ত, সারা পৃথিবী কৌতূহলী। এমনি সময় ফিলাডেলফিয়ার ক্যাপ্টেন নিকল বারবিকেনকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বাজি ধরে বসলেন। বারবিকেন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। এতে দেশের লোক আরও মেতে উঠলো।

এরই মধ্যে সেখানে এসে জুটলেন বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী

মিশেল আরদাঁ। তিনি বললেন,—কামানের গোলাটা একেবারে গোল না বানিয়ে বুলেটের মতো করুন। আমি ওর ভেতরে যাবো।

লোকটা বলে কী? পাগল নাকি? কিন্তু এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীটি যেমন প্রতিভাবান, তেমন দুঃসাহসী এবং অত্যন্ত একগুঁয়ে। এঁকে নিরস্ত করবে কে?

এর মধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটলো। ক্যাপ্‌টেন নিকল বাজি হারতে হারতে অধৈর্য হয়ে প্রকাশ্য সভায় বারবিকেনকে গালাগালি দিয়ে অপমান ক'রে ফেললেন। তার পরিণাম দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এই পৃথিবীতে হয় নিকল নয় বারবিকেন, একজন বেঁচে থাকবে।

খবর পেয়ে ভোরবেলাই আরদাঁ ছুটলেন রণক্ষেত্রে। সেখানে গিয়ে প্রস্তাব দিলেন, যুদ্ধের বদলে ওঁরা দু'জনেই চলুন গোলার মধ্যে।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে ওঁরা তিনজন গিয়ে বসলেন কামানের গোলার মধ্যে। সকলেরই মুখের ভাব শান্ত, কোনো রকম উত্তেজনা নেই—যেন রেলগাড়িতে চেপে এখান থেকে ওখানে যাচ্ছেন, এই রকম নিশ্চিন্ত ভাব। বিরাট এক বিস্ফোরণের পর গোলাটা শূন্যে ছুটে গেল। সেদিন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

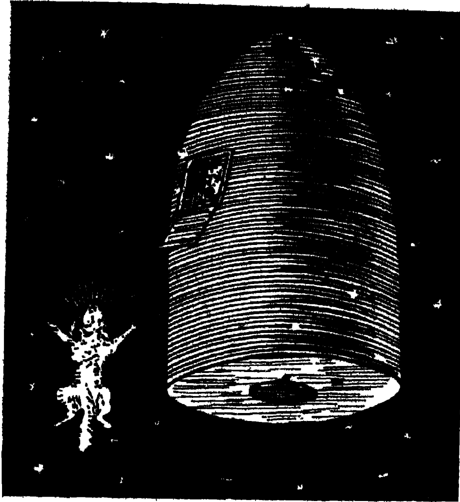
এর দু'দিন পরে কেম্‌ব্রিজের মানমন্দির থেকে ঘোষণা করা হ'ল গোলাটা নির্দিষ্ট গতিতে ছুটে চলেছে চাঁদের দিকে।

বইখানা এখানেই শেষ হ'ল। বইটা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ শোরগোল পড়ে গেল। এমনই বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে লেখা যে, অনেকেই মনে করলেন এরকম একটা ব্যাপার নিশ্চয় ঘটেছে। তাই এরপর কি হ'ল, তা জানবার জন্য অতৃপ্ত পাঠকরা ক্রমাগত দাবি জানাতে লাগলেন। পাঁচ বছর বাদে বেরুলো তাঁর চন্দ্র অভিযানের দ্বিতীয় বই 'চাঁদের চারদিকে'। শুরু করলেন, আগে যেখানে শেষ করেছিলেন ঠিক তার পর থেকে।

বিস্ফোরণের সময় তিনজনই গোলার মধ্যে তাঁদের আসন থেকে

ছিটকে পড়েছিলেন। অতি কষ্টে তাঁরা নিজেদের সামলে নিলেন। তখন দেখলেন, তাঁদের সঙ্গে যাত্রী হয়ে চলেছে আরও কয়েকটি প্রাণী—ছ'টো কুকুর ও কয়েকটি মুরগী। গোলাটা তখন অসীম শূন্যের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে চাঁদের দিকে।

এই সময় হঠাৎ এক বিপদ ঘনিয়ে এলো। ওঁরা কাচের



চিত্র ৫৯

জুল ভার্ন-এর কল্পিত ব্যোমযান চাঁদের দিকে এগিয়ে চলেছে। মস্তকে আঘাত লাগার ফলে 'স্যাটিলাইট' নামক কুকুরটি মারা যায় এবং তাকে ব্যোমযানের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যোমযানের সঙ্গে সঙ্গে মৃত কুকুরটিও আপন বেগে মহাশূন্যে এগিয়ে চলতে থাকে, যেমন নকল চাঁদবাহী রকেট কক্ষপথে স্থাপিত নকল চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে এগিয়ে চলে।

[প্রায় একশ' বছর আগে জুল ভার্ন-এর পুস্তকে এই চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।]



চিত্র ৬০

জুল ভার্ন-এর কল্পিত ব্যোমযানের যাত্রীরা শূন্যপথে তাঁদের দেহের ভার হারিয়ে ফেলেছেন। ভারশূন্য অবস্থায় তাঁরা ব্যোমযানের মধ্যে ভেসে রয়েছেন। (প্রায় একশ' বছর আগে, জুল ভার্ন-এর পুস্তকে এই চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।)

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

জানালা দিয়ে দেখলেন, পৃথিবী হারিয়ে গেছে অনেক দূরে, আর এদিকে ওঁদের সামনা-সামনি ছুটে আসছে বিরাট একটা উল্কা, ছুটে আসছে ওঁদের ধ্বংস ক'রে দিতে। এরূপ একটি বিপর্যয়ের কথা আগে কেউ ভাবতেই পারেন নি।

মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন আরদাঁ বললেন,—আমরা বিজ্ঞানের শহীদ হতে চলেছি, আসুন এই উপলক্ষে একটু স্ফূর্তি করা যাক!

কিন্তু প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ওঁরা সবাই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লেন। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখলেন যে তাঁরা কেউই মরেন নি। শুধু মাথায় আঘাত লাগার ফলে 'স্যাটিলাইট' নামক কুকুরটি মরে গেছে। ব্যাপার কী?

তাঁদের ভাগ্য ভাল, উল্কাটার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়নি। ওটা এক পাশ দিয়ে চলে গেছে। তবুও তারই অভিকর্ষের টানে এরূপ বিপর্যয় ঘটেছে।

মৃত কুকুরটিকে গোলার বাইরে ফেলে দেওয়া হ'ল। কিন্তু গোলার সঙ্গে সঙ্গে সেও আপন বেগে মহাশূন্যে এগিয়ে চললো।

এরপর ওঁরা ভারশূন্য এলাকায় প্রবেশ করলেন। জুল ভার্ন এখানকার যে কাল্পনিক বর্ণনা দিয়েছেন তার তুলনা নেই। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

কিন্তু সেদিন, বেলা প্রায় ১১টার সময়, নিকল একটি গেলাস হাত থেকে ফেলে দিলেন। কিন্তু সেটি, নীচে না পড়ে, বাতাসে ভেসে রইল।

"অ্যাঁ!" মিশেল আরদাঁ চীৎকার করে উঠলেন,—"এ তো বেশ অদ্ভুত রসায়ন!"

আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বস্তু, অস্ত্র-শস্ত্র, বোতল ইত্যাদি সব শূন্যে ভেসে বেড়াতে লাগলো—সে এক অলৌকিক ঘটনা। মিশেল ডায়ানাকে (কুকুর) শূন্যে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেও, কোন রকম কৌশল ছাড়াই, শূন্যে ভেসে থাকার সেই বিস্ময়কর খেলার

পুনরাবৃত্তি ক'রল, যেমন দেখাতেন (যাদুকর) রবার্ট হুডিনি, মাস্‌কেলীন এবং কুক্‌।

তিনজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী সেই বিস্ময়কর রাজ্যে পৌঁছে, বিচার শক্তি থাকা সত্ত্বেও, বিস্মিত এবং হতবুদ্ধি হয়ে অনুভব করলেন যে, তাঁদের দেহের ভার অন্তর্হিত হয়েছে। যখন তাঁরা তাঁদের বাহু প্রসারিত করলেন, তখন সেগুলি নীচে নামাবার কোন প্রবণতাই তাঁরা অনুভব করলেন না। তাঁদের মাথা ঘাড়ের উপর ইতস্ততঃ নড়তে লাগলো। তাঁদের পা গোলাটার তলদেশে আর থাকছিল না। তাঁরা মাতালের মতো টলছিলেন। কল্পনায় প্রতিবিম্ব হয় না অথবা ছায়া হয় না, এরূপ মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এখানে বাস্তবে, সক্রিয় শক্তিগুলির (পৃথিবীর এবং চাঁদের আকর্ষণ জনিত) প্রশমনের ফলে, এমন মানুষের সৃষ্টি হয়েছে যাদের মধ্যে কিছুরই ওজন নেই এবং যাদের নিজেদেরও কোনো ওজন নেই।

হঠাৎ মিশেল, সামান্য একটু লাফ দিয়ে, মেঝে ছেড়ে উঠলেন এবং মুরিলোর 'কুইসিন দেস আঙেস্‌' নামক গ্রন্থে বর্ণিত সৎ সন্ন্যাসীটির মতোই বাতাসে ভেসে রইলেন। এক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর বন্ধু দু'জনও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন; এবং তারা তিনজন, গোলাটার মাঝখানে, আরোহণের এক বিস্ময়কর দৃশ্য রচনা করলেন।

যাই হোক, এরপর চাঁদের অভিকর্ষ এলাকার মধ্যে প্রবেশ ক'রে ওঁরা স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন চাঁদের পাহাড়-পর্বত ও গর্ত, আগ্নেয়গিরির গহ্বর আর শুকনো সাগর। কিন্তু চাঁদের রৌদ্রালোকিত এবং অন্ধকার দিকে ঘুরতে ঘুরতে ওঁরা আবিষ্কার করলেন যে, উল্কার প্রভাবে গোলাটার গতিপথ কিছুটা বদলে গেছে। ওঁদের পক্ষে চাঁদে নামা আর কোনদিনই সম্ভব হবে না। কৃত্রিম উপগ্রহের মতো গোলাটা চাঁদের চারপাশে ঘুরতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। এখন উপায়?

"আমি ভাবছি," মিশেল চীৎকার ক'রে উঠলেন, "আমরা কী বোকা!"

"আমরা তা নই, এমন কথা বলছি না," বারবিকেন উত্তর দিলেন, "কিন্তু কেন?"

"কারণ, যে গতিবেগ আমাদের চাঁদ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে, তা কমাবার খুব সহজ ব্যবস্থা আমাদের আছে, কিন্তু তা আমরা ব্যবহার করছি না।"

"সেই ব্যবস্থাটা কী?"

"আমাদের যে-সব রকেট আছে, তাদের ধাক্কার বল সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা।"

"অ্যাঁ! কিন্তু তা করা হচ্ছে না কেন?" নিকল বললেন।

"আমরা এখন পর্যন্ত ঐ বলের সদ্ব্যবহার করিনি, একথা সত্যি," বারবিকেন বললেন, "কিন্তু এইবার আমরা তা করব।"

"কখন?" মিশেল জিজ্ঞেস করলেন।

"যখন সময় আসবে। আমার বন্ধুগণ, ভেবে দেখুন, গোলাটা এখন যে অবস্থানে আছে, এমন অবস্থান যাতে সে এখনও চাঁদের গোলকের সামনে রয়েছে তেরচাভাবে, তাতে আমাদের রকেটগুলি তার গতিপথ বদলে তাকে চাঁদের কাছে না নিয়ে বরং আরও দূরে নিয়ে যেতে পারে। এখন আমার ধারণা, আপনারা তো চাঁদেই পৌঁছাতে চান?"

"নিশ্চয়ই," মিশেল উত্তর দিলেন।

রকেটগুলো রাখা হয়েছিল চাঁদে নামার সময় গোলাটার গতিবেগ কমাবার জন্য, যাতে গোলাটা চাঁদের বুকে আছড়ে না পড়ে। কিন্তু এখন এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা এর ঠিক উল্টোটা করবার জন্যই রকেট ছোঁড়ার প্রস্তাব করলেন।

কিন্তু রকেট ছোঁড়ার পর দেখা গেল, ওঁরা চাঁদের আরও কাছে না গিয়ে বরং ছুটে চলেছেন পৃথিবীর দিকে। ক্রমে পৃথিবীর

অভিকর্ষের এলাকায় পৌঁছে ওঁরা হু হু ক'রে নামতে লাগলেন পৃথিবীর দিকে।



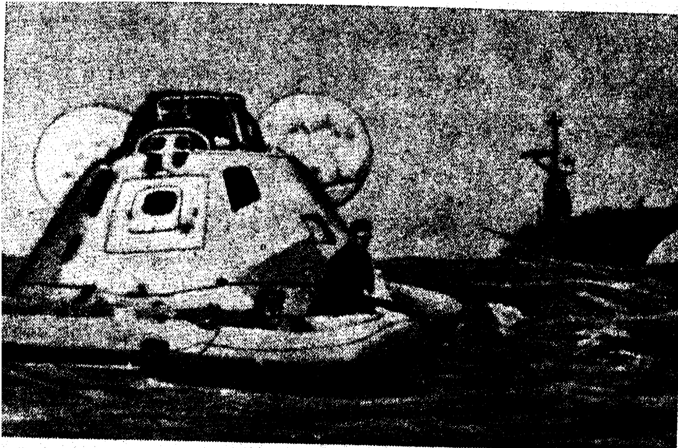
চিত্র ৬১

জুল ভার্ন-এর কল্পিত ব্যোমযান, তিনজন দুঃসাহসী অভিযাত্রীসহ, ঝপাং ক'রে আছড়ে পড়লো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। অদূরে অপেক্ষমান একটি জাহাজের নাবিকরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে এলেন তাঁদের উদ্ধার করার জন্য। (প্রায় একশ' বছর আগে জুল ভার্ন-এর পুস্তকে এই চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।)

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

তারপর এক সময় তিনজন দুঃসাহসী অভিযাত্রীকে নিয়ে গোলাটা ঝপাং ক'রে আছড়ে পড়লো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। অদূরে অপেক্ষমান একটি জাহাজের নাবিকরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে এলেন তাঁদের উদ্ধার করার জন্য।

জুল ভার্ন তিনজন মানুষকে ফ্লোরিডা থেকেই চাঁদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা খুব কাছে থেকে চাঁদকে দেখে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন এবং নির্বিঘ্নে অবতরণ করেছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরে। প্রায় একশ' বছর পরে এখন অ্যাপোলো-৮-এর বিবরণ পড়লে মনে হবে, ভার্ন-এর উপন্যাস থেকেই যেন পাতার



চিত্র ৬২

প্রায় একশ' বছর আগে প্রকাশিত জুল ভার্ন-এর কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে আজকের বাস্তব ঘটনার কী অদ্ভুত মিল! অ্যাপোলো-৮ অভিযান শেষে তিনজন মহাকাশযাত্রীসহ ক্যাপসুলটি ঝপাং ক'রে আছড়ে পড়লো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে অদূরে অপেক্ষমান 'ইয়র্কটাউন' জাহাজ থেকে উদ্ধারকারীর দল সেখানে ছুটে এলেন।

[ইউ. এস্. আই. এস্.-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

পর পাতা ঢুকে দেওয়া হয়েছে। এইখানেই লেখক হিসেবে ভার্ন-এর কৃতিত্ব।

ভার্ন-এর লেখায় বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং কল্পনাশক্তির এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। কিন্তু এসব যে কোনদিন বাস্তব-ক্ষেত্রে সম্ভব হ'তে পারে তখন তা কেউ ভাবতেই পারেনি। সবাই একে গ্রহণ করেছিল একটি নিছক কাল্পনিক কাহিনী হিসেবেই।

১৯২০ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী গডার্ডই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ রকেটের সাহায্যে চাঁদে যেতে পারবে। দুঃখের বিষয়, তখন তাঁর এই উক্তি নিয়ে বহু সংবাদপত্র ব্যঙ্গ করেছিল। আর এজন্য জনসাধারণের অনেকেই তাঁকে পথে-ঘাটে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রত। কিন্তু গডার্ড তাতে বিচলিত না হয়ে, নির্ভীক-ভাবে সাধনার পথে এগিয়ে যান। তাঁরই সাধনালব্ধ ফল মহাকাশ-ভ্রমণ সার্থক ক'রে তুলেছে।

অ্যাপোলো-১১-এর অভিযান সফল হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ সাফল্যের সঙ্গে চাঁদে নেমে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। কাজেই রকেটে ক'রে চাঁদে যাওয়ার প্রস্তাব আজ আর অলীক কল্পনার বিষয় নয়। চাঁদে যাতায়াতের প্রশ্নটি পরিকল্পনার স্তর থেকে এখন বাস্তব রূপায়ণের স্তরে এসেছে। অনেকেরই বিশ্বাস, আর দশ বছরের মধ্যেই হয়তো চাঁদে রকেট-সার্ভিস চালু হয়ে যাবে। আর তা যদি হয়, তবে তখন ছুটির অবসরে সিমলা কিংবা মুসৌরির পাহাড়ে না গিয়ে, চন্দ্রলোকে বেড়াতে যাবার কথা ভাবতে দোষ কী? মহাকাশে ভ্রমণের আনন্দ তো থাকবেই, সেই সঙ্গে মিশে থাকবে অনেকখানি রোমান্সের স্বাদ!

এক জ্যোতিষ্ক থেকে আর এক জ্যোতিষ্কের মাটিতে, এক কথায় বলতে গেলে, মহা-অবতরণ। মানুষের আড়াই হাজার বছরের বিজ্ঞানসাধনার এক সফল পরিণতি। তবে চাঁদে পৌঁছানো যে শুধু একটা বৃহৎ পরিকল্পনার, একটা দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ

হ'ল, তা নয়। আসলে এ হ'ল আরও অনেক বড় বড় অভিযানের আরম্ভ। এবারে গ্রহ-গ্রহান্তরে যাবার চেষ্টা হবে। আর মহাকাশে চাঁদই হবে প্রথম মহাকাশ-বন্দর বা আন্তঃগ্রহ স্টেশন। এখান থেকেই শুক্র, মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহে রকেট ছোঁড়া হবে। এই ছোট্ট পৃথিবীর সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে আবদ্ধ থেকে মানুষ আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, এবার মহাকাশ জুড়ে তার যাতায়াত চলবে। কবে সেই শুভদিন আসবে তারই অপেক্ষায় আমরা অধীর আগ্রহে দিন গুনবো।

পরিশিষ্ট

চাঁদ সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য

১। পূর্ণিমার চাঁদ গোলাকার, কিন্তু তারপর রোজ চাঁদ কিছুটা ক'রে ছোট হ'তে হ'তে কাস্তের মতো সরু হয়ে যায় এবং অমাবস্যার রাতে তাকে একেবারেই দেখা যায় না। এর কারণ কী?

চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। পৃথিবীর আকর্ষণে বাধা প'ড়ে এ তার চারদিকে ঘুরছে। এর নিজস্ব কোনো আলো নেই, সূর্যের আলোতেই এ আলোকিত। কিন্তু সূর্যের আলোয় চাঁদের যে অংশ আলোকিত হয়, তার সবটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে না। চাঁদের অবস্থান অনুসারে এই আলোকিত অংশ কখনও কম, আবার কখনও বেশী দেখা যায়। প্রতি মাসে পূর্ণিমার রাতেই শুধু পৃথিবী থেকে চাঁদের আলোকিত অংশ সবটা দেখা যায়। আর অমাবস্যার রাতে তা একেবারেই দেখা যায় না।

সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলের মাঝে চাঁদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ ক'রলে বোঝা যায়, পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের এভাবে ঘুরতে লাগে ২৭⅓ দিন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে পৃথিবী তার কক্ষপথে একটু এগিয়ে যায়, কাজেই এক পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হয় প্রায় ২৯½ দিন। এজন্য চাঁদের একটা দিন বা রাত্রির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫টি পার্থিব দিনের সমান। অর্থাৎ, চাঁদের একটা পুরো দিন (দিন + রাত্রি) এক চান্দ্রমাস অর্থাৎ প্রায় ২৯½ দিনের সমান।

২। চাঁদ দেখতে একটি গোলকের মতো। এর ব্যাস প্রায় ২,১৬০ মাইল (৩,৪৭৮ কিলোমিটার), অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ¼ অংশ।

৩। এর ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় $\frac{১}{৮১}$ অংশ, আর অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রায় ⅙ অংশ। এজন্য পৃথিবীতে যার ওজন ৬০ কিলোগ্রাম, চাঁদে গিয়ে তার ওজন দাঁড়াবে ১০ কিলোগ্রাম।

৪। এর গড় ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় ৩·৩ গুণ। পৃথিবীর গড় ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় ৫·৫ গুণ।

৫। ছোট এবং হালকা ব'লে চাঁদ তার চারদিকে কোনো আবহমণ্ডল ধরে রাখতে পারেনি।

৬। পৃথিবীর চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ কখনও ২,২১,৪৬০ মাইল (৩,৫৬,৫৫০ কি. মি.) দূরত্বে চলে আসে, আবার কখনও ২,৫২,৭১০ মাইল (৪,০৬,৮৬৩ কি. মি.) দূরত্বে চলে যায়। এজন্য পৃথিবী থেকে তার গড় দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় ২,৩৯,০০০ মাইল (৩,৮৪,৭৯০ কি. মি.)।

৭। পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে চাঁদের যতটুকু সময় লাগে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে চাঁদ নিজের মেরুদণ্ডের উপরও একবার পাক খায়। এজন্য চাঁদের একটা দিকই সব সময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। চাঁদের অন্য পিঠে কী আছে, পৃথিবী থেকে তা কখনও দেখা যায় না।

৮। কোনো আবহমণ্ডল না থাকায়, দিনের বেলায় চন্দ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা ১০০° সেন্টিগ্রেডেরও উপরে উঠে যায়। পৃথিবীতে এই উষ্ণতায় জল ফোটে। ভূপৃষ্ঠে সবচেয়ে গরম হয় সাহারা মরুভূমি, কিন্তু সেখানেও উষ্ণতা ৫৮° সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশী হয় না। আবার রাত্রিবেলা চন্দ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা নামতে নামতে −১৫০° সেন্টিগ্রেডেরও নীচে নেমে যায়। ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতা সবচেয়ে নীচে নামে দক্ষিণ-মেরুতে, কিন্তু সেখানেও উষ্ণতা −৭৫° সেন্টিগ্রেডের নীচে নামে না। অল্পসময়ের মধ্যে প্রায় ২৫০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার তারতম্য সহ্য ক'রে বেঁচে থাকা পৃথিবীর কোনো জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়।

৯। চাঁদ দেখতে অনেকটা বসন্তরোগের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত মুখের মতো। চন্দ্রপৃষ্ঠে এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে অজস্র আগ্নেয়গিরির মুখবিবর বা জ্বালামুখ (crater)। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির আকার পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির মতোই; আংটির মতো উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা খানিকটা গোলাকার সমভূমি, ঠিক যেন এক-একটি প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম। আবার এক-একটির আকার ভারি অদ্ভুত, আগ্নেয়গিরির মুখবিবরের মাঝখানে রয়েছে দীর্ঘ ছুঁচালো টিলা (গিরি-কেন্দ্রিক গহ্বর)।

চন্দ্রপৃষ্ঠ মোটেই সমতল নয়, উঁচু-নীচু ছোট-বড় অনেক পাহাড়-পর্বত আর গর্তে ভর্তি। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ এভারেস্ট-এর উচ্চতা প্রায় ২৯ হাজার ফুট। কিন্তু চাঁদের উচ্চতম পর্বত-শৃঙ্গ 'মাউন্ট লিব্‌নিৎস' এর চেয়েও প্রায় ছ' হাজার ফুট বেশী উঁচু। এছাড়া বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অনেক কালো কালো ছোপ দেখা যায়। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এগুলিকেই সাগর ব'লে ভুল করেছিলেন। কিন্তু কালো ছোপগুলি সবই চাঁদের সমভূমি, এদের কোনটিতেই এক ফোঁটা জল নেই।

১০। মহাকাশের অভিযাত্রীরা সম্প্রতি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ক'রে দেখেছেন শুধু ধু-ধু বিরস প্রান্তর। তাঁরা বলেছেন—চাঁদের ধূসর ভূমি দেখতে অনেকটা মরুভূমির মতো, বালুকাময়, তার এখানে-ওখানে ছড়ানো রয়েছে ছোট-বড় পাথরের নুড়ি, আর বড় বড় পাথরের চাঁই।

চাঁদের ধূসর মাটিতে মহাকাশচারীদের পা এক ইঞ্চি কি দু' ইঞ্চি প্রায় বসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। মাত্র তিন ইঞ্চি গভীরতায় স্যাঁতস্যাঁতে মাটি পাওয়া গেছে। তবে তাতে জল পাওয়া যায়নি।

শান্ত-সাগর এলাকা থেকে কুড়িয়ে আনা পাথরকুচির মধ্যে যে-সব গ্যাস পাওয়া গেছে, সেগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন চান্দ্র গবেষণাগারের চারজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী; এঁরা হলেন নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শেফার ও ডঃ ফান্থহাউসার, জারমানির ম্যাক্স প্ল্যান্ক ইন্‌স্টিটিউটের ডঃ জারিঙ্গার এবং হিউস্টনের মহাকাশ-ঘাঁটির ডঃ বোগার্ট।

এঁরা ঘোষণা করেছেন যে, পাথরকুচিগুলিতে সূক্ষ্মতম পরিমাণে যে-সব গ্যাস পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যায়, পাথরগুলি পৃথিবীর প্রাচীনতম পাথরগুলিরই সমবয়সী। তাছাড়া পাথরকুচিগুলি অবিরাম মহাকাশ-রশ্মির বর্ষণের মধ্যে কাটিয়ে এসেছে, সে প্রমাণও মিলেছে। সব মিলিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, চাঁদের শান্ত-সাগর এলাকায় পাথরকুচিগুলি আড়াই শ' কোটি বছর থেকে সাড়ে তিন শ' কোটি বছর কাটিয়েছে এবং এই দীর্ঘকাল সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছুরিত তেজস্ক্রিয় রশ্মি তাদের উপর অবিরাম বর্ষিত হয়েছে।

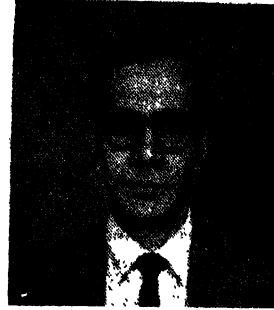
বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে পাথরকুচিগুলি সম্পর্কেও প্রাথমিক সমীক্ষা শেষ করেছেন। কতকগুলি মৌলের পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশী, আবার কতকগুলির পরিমাণ খুবই কম। তাছাড়া এগুলির মধ্যে কাচ-জাতীয় জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই তাঁরা মনে করছেন যে, চাঁদের বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবী থেকে অনেকাংশে আলাদা। এসম্পর্কে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

১১। চাঁদের পাথর ও মাটির কোনও নমুনাতেই আজ অবধি এক ফোঁটা জলেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি, যদিও পৃথিবীর সবচেয়ে শুষ্ক পাথরের মধ্যেও জলের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়। তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, চাঁদের সুউচ্চ পর্বত-শিখরে, অথবা মাটির নীচে, জমাট বরফরূপে জল থাকলে থাকতেও পারে। তবে এ সম্পর্কে কোন নিশ্চিত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

১২। চাঁদে কোনো রকম জনপ্রাণী থাকা সম্ভব নয়, অন্ততঃ আমরা যেরকম জীবন দেখতে অভ্যস্ত, সেরূপ তো নয়ই। মহাকাশচারীরা চাঁদের বুকে অতীত বা বর্তমান কোনরূপ জীবনেরই সন্ধান পাননি। তাঁরা যে-সব পাথর বা মাটির নমুনা নিয়ে এসেছেন, সেগুলি পরীক্ষা ক'রেও কোন প্রকার জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

লেখকের পরিচয়

জন্ম ১৯১৯ সালে, 'বাংলা দেশ'-এর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণায়। পিতা রমণীকান্ত গুহ। আদি নিবাস ঐ জেলারই টাঙ্গাইলের অন্তর্গত আমুরিয়া গ্রামে। শিক্ষা প্রথমে রাজশাহী কলেজে, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে। কৃতী ছাত্ররূপে তাঁর সুনাম ছিল। রসায়নশাস্ত্রে সম্মানসহ বি. এস্-সি. পাশ করেন ১৯৩৮ সালে। তারপর রসায়নশাস্ত্র নিয়ে ১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এস্-সি. পরীক্ষা পাশ করেন, এবং প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় ঐ কলেজ থেকে 'কানিংহাম মেমোরিঅ্যাল' পুরস্কার পান। উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন, প্রথমে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে। ভারতের ভেষজ উদ্ভিদ্ সম্পর্কে গবেষণা ক'রে ১৯৫২ সালে 'গ্রিফিথ মেমোরিঅ্যাল' পুরস্কার এবং ১৯৫৫ সালে ডি. ফিল্. ডিগ্রী পান। তাঁর গবেষণার বিষয় দেশ-বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে এবং পাঠ্যপুস্তকেও স্থান পেয়েছে।


অধ্যাপক ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি অধ্যাপনাকর্মে লিপ্ত আছেন। ইতিপূর্বে রাজশাহী, প্রেসিডেন্সী, হুগলী মহসীন, মৌলানা আজাদ ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের পদে (W. B. S. E. S.) অধিষ্ঠিত।

ছাত্রাবস্থায়ই লেখা শুরু করেন, আজও তার বিরাম নেই। প্রথম প্রকাশিত রচনা 'সবুজ পাতা'—অধুনালুপ্ত 'স্বদেশ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, ১৯৩৭ সালে। আজ অবধি শতাধিক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি রচনা 'ভারতকোষ'-এ স্থান পেয়েছে।

তাঁর 'জড় ও শক্তি' নামক পুস্তকের প্রকাশক বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, আর 'পেট্রোলিয়ম' নামক পুস্তিকাটি বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজে স্থান পেয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'বিজ্ঞানিকা' নামক গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ 'আকাশ ও পৃথিবী' ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত হয় এবং 'বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা' নামক অপর একটি গ্রন্থ ১৯৬৯ সালে ইউনেস্কো-পুরস্কারে সম্মানিত হয়। বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্যে ১৯৭০ সালে তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থের নাম 'চল যাই চাঁদের দেশে'। এইসব গ্রন্থের প্রকাশক 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড'।